অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

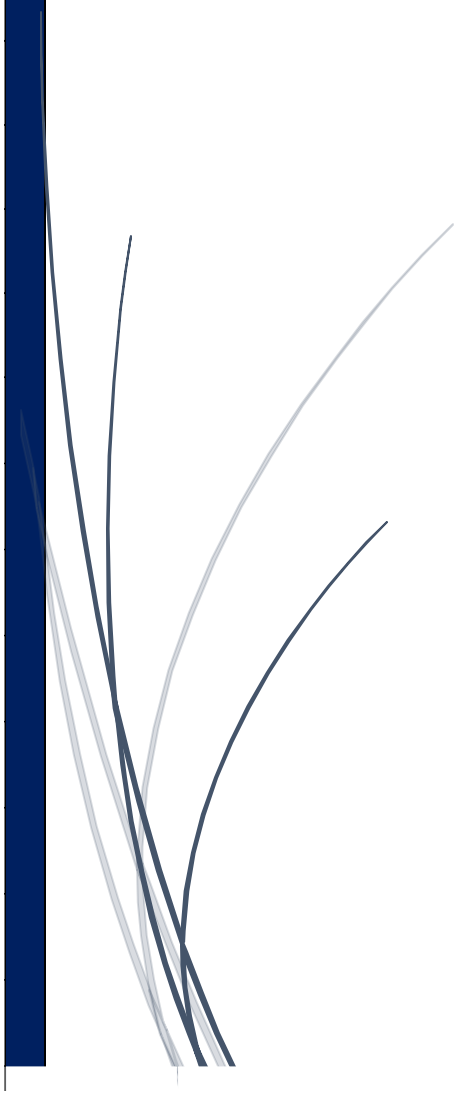

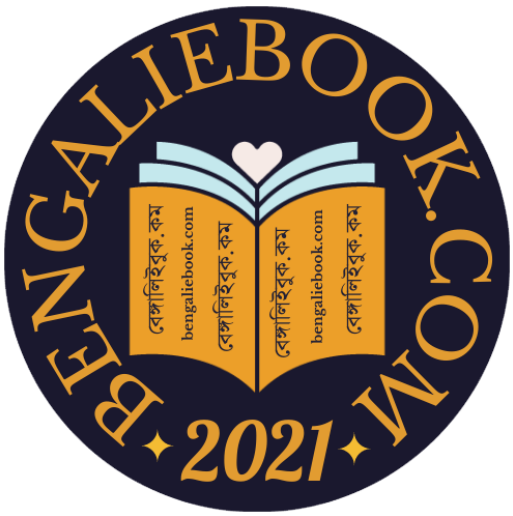

সূচিপত্র

০১-০৫. ঐ গবা পাগলা বেরিয়েছে 2
০৬-১০. কুন্দকুসুম চোখ বোজেননি 30
১১-১৫. অনেক ভেবে চিন্তে গান্টু বলল 62
১৬-২০. লাফের চোটে গোবিন্দ 88
২১-২৫. রামু নিরুদ্দেশ 111
২৬-৩০. যখন একটু ধাতস্থ হল নয়নকাজল 139
৩১-৩৬. ধীর গম্ভীর স্বরে সাতনা বলল 163

০১-০৫. ঐ গবা পাগলা বেরিয়েছে

ঐ গবা পাগলা বেরিয়েছে। গায়ে একটা সবুজ রঙের আলপাকার কোট আর ভোলা কালো রঙের পাতলুন। বড়-বড় কটাশে চুল রোগাটে মাঝারি চেহারা। এক গাল দাড়ি, বিশাল মোচ। পায়ে খয়েরি রঙের ক্যামবিসের জুতো। হেঁকে বলছিল, "কেয়াসমাস! কেয়াসমাস! বর্বর ছেলেরা দৌড়িয়া ফেরে। সরল রেখা কাকে বলে? দুটি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বই হচ্ছে সরলরেখা। এন এ সি এল ইজ সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাণ্ড ইট ইজ কমন সলট। ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে আসে চোদ্দ শো আটানব্বই সালে.....হেঁ হেঁ জানি বাবা, সব জানি।"

সকালবেলা হরিহরবাবু আর গদাধরবাবু বাজার করে ফিরছিলেন। গবা পাগলাকে দেখে হরিহরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এঃ, আবার দেখি গবাটা উদয় হয়েছে! ছেলেপেলেগুলোর মাথা খাবে আবার!"

গদাধরবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনার কথাটা মানতে পারছি না হরিহরবাবু। গবা পাগলা যে একজন ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক এ কথা সবাই জানে।"

হরিহরবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিকরা তো আজকাল গাছে ফলে কিনা! পেরেছে গবা পাগলা আপনার দেয়ালঘড়িটা সারাতে?"

গদাধরবাবু একটু গরম হয়ে বললেন, "পেরেছে বই কী! আলবাত পেরেছে।"

হরিহরবাবু হোহো করে হেসে বলেন, "তাই বুঝি আপনার দেয়ালঘড়ির কাটা উল্টোদিকে ঘোরে?"

“সেইটেই তো বিস্ময়! আর কার ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে ঘোরে বলুন তো? বৈজ্ঞানিক ছাড়া পারে কেউ ঘড়ির কাটাকে বিপরীতগামী করতে?”

এইভাবে হরিহরবাবু আর গদাধরবাবুর মধ্যে একটা তর্কবিতর্ক পাকিয়ে উঠছিল।

আগের দিন দুধের মধ্যে একটা কুঁচো চিংড়ি পেয়েছিলেন হালদারবাড়ির বুড়ি। তাই গয়লাকে বকছিলেন। গবা পাগলার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একগাল হেসে বলেন, “বাব্বাঃ! কতদিন পরে গবাসাধু আবার এ পোড়া শহরে ফিরেছে! এবার আমার কাকালের ব্যথাটার একটা হিল্লে হবে।”

গুণধরবাবু তাঁর বাগানে নেতিয়ে পড়া একটা লাউডগাকে মাচানে তুলছিলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে গবা পাগলাকে দেখে গিন্নিকে ডাক দিয়ে বললেন, “গবা চোরটা আবার এসেছে জিনিসপত্র সব সামলে রেখো। সেবার ও হাওয়া হওয়ার পর থেকেই আমাদের দু দুটো কাসার বাটি গায়েব হল।”

দুই ভাই-আন্দামান আর নিকোবর জানালার ধারে বসে অ্যানুয়্যাল পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিল। আন্দামান অঙ্কে কঁচা, নিকোবর কঁচা ইংরেজীতে।

আন্দামান গবা পাগলাকে জানালা দিয়ে দেখেই চাপা গলায় বলল, “আগের বারের মতো এবারেও গবাদা ঠিক পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে চেঁচিয়ে অঙ্ক বলে দেবে। বাঁচা গেল বাবা, অঙ্ক নিয়ে যা ভাবনা ছিল!”

নিকোবরও চাপা গলায় বলল, “আমার কুড়ি নম্বরের ট্রানস্লেশনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল।”

বোধনের সকালের পড়া হয়ে গেছে। এবার নেয়ে-খেয়ে স্কুলে যাবে। হাতে খানিকটা সময় আছে দেখে সে তার মহাকাশযানে কিছু যন্ত্রপাতি লাগাচ্ছিল। তার মহাকাশটানটা দেখলে যে-কেউ অবশ্য নাক সিঁটকাবে। কারণ সেটা আসলে একটা ফুলঝাটা। ঝাটার হাতলের সঙ্গে গোটা চারেক হাউই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। ঝাটার সঙ্গে একটা কৌটোও বাঁধা

আছে। তার ইচ্ছে ঐ কৌটোয় কয়েকটা পিঁপড়ে ছেড়ে দেবে। আজ সে মহাকাশযানের সঙ্গে মেজোকাকার সাধের পকেট-ট্রানজিসটার রেডিওটা চুপি-চুপি লাগিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় রাস্তায় গবা পাগলার হাঁকডাক শোনা গেল : "দেখবি যদি ভুতের নাচ, ধর বাগিয়ে বঁটাগাছ, ডিং মেরে ওঠ গাধার পিঠে।নখুড়োর ঘর পেরিয়ে ঈশানকোণে যা হারিয়ে, লাগবে হাওয়া মিঠে। দেখতে পাবি তিনঠেঙে গাছ, তাহার ডালে ঝুলতেছে মাছ নীচে গহিন ছায়া। সেই ছায়ারই কায়া ধরে ভুত-ভুতুড়ে অদ্ভুতুড়ে নাচতেছে সব মায়া..... . "

বোধন দৌড়ে রাস্তার ধারে গিয়ে চেঁচিয়ে বলে, "ও গবাদা! মঙ্গলগ্রহ থেকে জ্যান্ত পাথর এনে দেবে বলেছিলে যে! সেইসব পাথর নাকি আপনা থেকেই গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে ছোট থেকে বড় হয়, রেগে গেলে একটা গিয়ে আর-একটাকে ছুঁ মারে!"

হেঃ হেঃ করে হেসে গবা পাগলা বলে, "চার দুগুনে আট এ তো সবাই জানে। কিন্তু বলো তো বাছাধন, হ্যারিকেনকে পেনসিল দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

থানার দারোগা কুকুসুমের নামটা যত নরম, মানুষটা ততই শক্ত। ছ ফুট লম্বা দশাসই চেহারা। গলার স্বরে স্পষ্ট বাঘের ডাক। রোজ আড়াইশো করে বুকডন আর বৈঠক মারেন। রাগলে ভিসুভিয়াস। বাস্তবিকই নাকি রাগন্ত অবস্থায় তার মাথার চারপাশে একটা লালচে মতো আভা অনেকে দেখেছে। কুকুসুমের ভয়ে এই অঞ্চলের গুণ্ডা বদমাস চোর বাটপাড় সব রোগা হয়ে যাচ্ছে, ভাল করে খেতে পারে না, ঘুমোতে পায় না, ঘুমোলেও দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে যায়। সকালবেলায় কুন্দকুসুম সবে থানায় এস কোমরের বেল্টটা খুলে রেখে গায়ে একটু হাওয়া লাগাচ্ছেন, এমন সময় রাস্তায় গবার চেঁচানি শোনা গেল, "সবাই জানে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু বুদ্ধি পালালে কী বাড়ে? অ্যাঁ?"

কুলকুসুম সিধে হয়ে বসে বললেন, "স্পাইটা আবার এসেছে। ওরে, নজর রাখিস। নজর রাখিস!"

কিন্তু গবা কোথাকার স্পাই কার স্পাই তা কুন্দকুসুম ঠিক জানেন না। এর আগেও তিনি গবাকে ধরে এনে বিস্তর জেরা করেছেন, খোঁজ-খবর নিয়েছেন, কোনো তথ্য আবিষ্কার করতে পারেননি। তার্তে তাঁর সন্দেহটা আরো ঘোরতর হয়েছে।

"এই যে গবাঠাকুর" –বলে একপাল পেঁয়ো মেয়ে-পুরুষ রাস্তার মাঝখানেই ঢিবঢিব করে গবা পাগলাকে প্রণাম করল। তারা সব হাটবারে আনাজপাতি, ধামাকুলো, গোরু ছাগল, মুর্গি ডিম, ধান চাল, দড়িদড়া নিয়ে বেচতে যাচ্ছে শহরে। তাদের ধারণা, গবাঠাকুর আকাশে উড়তে পারে, অদৃশ্য হতে পারে, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে, যে-কোন রোগ হাতের ছোঁয়ায় সারিয়ে দিতে পারে।

গবা তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "হবে হবে, সব হবে, একবার যদি ছুঁচে সুতোটা পরাতে পারি। দেখিস খন, সব অকাল চলে যাবে, ক্ষেতে-ক্ষেতে ধান আর ধরবে না, পুকুরে নদীতে মাছের গাদি লেগে যাবে। দাঁড়া একবার, ছুঁচে সুতোটা পুরাই....."

বাঘা ওস্তাদা গাইয়ে রাঘব ঘোষ সকালের দিকেটায় গলা সাধছিলেন। রোজই সাধেন। ভারী দাপুটে গলা। সাতটা সুর একেবারে রামধনুর মতো তার গলায় লেগে থাকে।

ঘণ্টা তিনেক গলার কসরত করায় এই শীতকালেও বেশ ঘেমে গেছেন রাঘব ঘোষ। একটু জিরিয়ে জর্দাপান মুখে দিয়ে তানপুরাটা সবে তারায় জড়িয়ে ধরে পিড়িং করেছেন মাত্র, অমনি মূর্তিমান গবা ঘরে ঢুকে বলল, "আরে সা লাগাও! সা লাগাও। একবার যদি ঠিকমতো 'সা'-টা লাগাতে পারো, তাহলেই হয়ে গেল, সুরে জগৎ ভেসে যাবে। 'সা' লাগালে 'রে' আসবে মা রে বাবা রে বলে তেড়ে। রে এলে কি আর 'গা' দূরে থাকবে গা? এসে যাবে গা দোলাতে-দোলাতে। 'গা' যদি এল তবে 'মা'-এর জন্য আর ভাবনা কী গো? মা তো মায়ের মতো কোল পেতেই আছে। আর মা এর পা ধরেই সেধে আসবে 'পা'! পা-এর পিছু পিছু ধেয়ে আসবে 'ধা'। ধাঁ ধাঁ করেই আসবে হে। আর কী বাকি থাকে? 'নি'? নির্ঝঞ্ঝাটে আসবে, নির্ঝঞ্ঝাটে আসবে। নিত্যি নিত্যি আসবে, নৃত্য করতে

করতে আসবে। এইভাবেই পৌঁছে যাবে তার গ্রাম। ধরো ফের চড়ায় গিয়ে 'সা'-এর চুলের মুঠি। বুঝলে? সা লাগাও হে, ঠিকমতো সা লাগাও।"

রাঘব ঘোষ বুঝলেন না। তবে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। গবা এল, জীবনে আর শান্তি রইল না।

তবে গবা আসায় শহরে যে একটা শোরগোল পড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্ধববাবু ভারী রাসভারী লোক। তার সারা জীবনটাই রুটিনে বাঁধা।

তেমনি রুটিনে বাঁধা তার তিন ছেলে আর তিনমেয়ের চলা-ফেরা, লেখাপড়া, খেলাধূলো। তার গিন্নিও রুটিন মেনে চলেন। চাকরবাকর ঝি তো বটেই, তার বাড়ির গোরু ছাগল কুকুর বেড়াল পর্যন্ত কেউই রুটিনের বাইরে পা দেয় না। উদ্ধববাবু বলেন, ডিসিপ্লিন ইজ দি এসেন্স অব সাকসেস।

মুসকিল হল মাসখানেক আগে তিনি একটা ভালজাতের কাকাতুয়া কিনেছেন। তার ইচ্ছে ছিল, তাকাতুয়াটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন তৈরি করবেন যাতে সেটা তাঁর গবেট ছোট ছেলে রামুটাকে উঠতে-বসতে ডিসিপ্লিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। উদ্ধববাবুর ছোট ছেলেটাই হয়েছে সবেচেয়ে সৃষ্টিছাড়া। শাসনে থাকে, দুষ্টুমিও বেশি করতে পারে না বটে, কিন্তু সে এই বাড়ির আবহাওয়া ঠিক মেনেও চলে না। আকাশে রামধনু উঠলে রামু হয়তো বাইরে গিয়ে দুহাত তুলে খানিক নেচে আসে। ঘুড়ি কাটা গেল দৌড়ে যায় ধরতে। অঙ্কের খাতায় একদিন লিখে রেখেছিল, "কে যায় রে ভোগাড়িতে উড়িয়ে ধূলো? যা না ব্যাটা..... দেখে শিউরে উঠেছিলেন উদ্ধববাবু। ঐটুকু ছেলে কবিতা লিখবে কী? কিন্তু কতই বা আর একটা ছেলের পিছনে লেগে থাকবেন তিনি? তার তো কাজকর্ম আছে! মস্ত উকিল, দারুণ নামডাক, ব্যস্ত মানুষ। তাই ঠিক করেছিলেন, কাকাতুয়াটাকে রামুর পিছনে লাগিয়ে দেবেন। সে বলবে, "রামু পড়তে বোসো। রামু এবার স্নান করতে যাও। রামু,

আজ আধ ঘন্টা বেশী খেলেছ।রামুরামধনু দেখতে যেওনা।রামু, কাটাঘুড়ি ধরতে নেই.....ইত্যাদি।

কিন্তু মুশকিল হল, কাকাতুয়াটা প্রথম দিনই নিজে থেকে বলে উঠল, "আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। বিশু বাতিটা নিভিয়ে দাও। ওঃ, কী মশা! কী মশা!"

ধৈর্য ধরে উদ্ধববাবু পরদিন তাকে আবার রামু-শাসন শেখাতে বসলেন। কাকাতুয়াটা গম্ভীরভাবে শুনল। তারপর বলল, "বিশু, আমার খাবারে খুব ঝাল দিও।" উদ্ধববাবু কটমট করে পাখির দিকে চেয়ে বললেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে?" কাকাতুয়াটা এ-কথায় খক-খক করে হেসে বলল, "আমার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। খকখক।"

উদ্ধববাবু পরদিন আবার পাখিকে পড়াতে বসালেন। পাখি তাকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বলল, "বালিশের তলায় কী খুঁজছ বিশু? আলমারির চাবি?"

উদ্ধববাবু বললেন, "আহা, বলো, রামু এখন ঘুম থেকে ওঠো।"

পাখি বলল, "বিশু, আমার ঘুম পাচ্ছে। আলমারিতে টাকা নেই। অন্য জায়গায় আছে।"

উদ্ধববাবু বললেন, "হোপলেস।"

.

০২.

কাকাতুয়াকে শেখাতে গিয়ে উদ্ধববাবু ঘেমে ওঠেন। রেগে গিয়ে চেঁচাতে থাকেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?" কাকাতুয়াটা একথাটা খুব টক করে শিখে নেয়। ঘাড় কাত

করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলে, "ইয়ার্কি হচ্ছে? অ্যাঁ! ইয়ার্কি?"

"নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। টাকাটাই জলে গেল দেখছি।" উদ্ধববাবু হতাশভাবে এই কথা বলে উঠে পড়লেন। নেয়ে খেয়ে আদালতে যেতে হবে।

কাকাতুয়াটা পিছন থেকে বলল, "টাকাটাই জলে গেল দেখছি।"

আড়াল থেকে কাকাতুয়া ভারসাস উদ্ধববাবুর লড়াইটা ছেলেমেয়েরা রোজই লক্ষ্য করে।

সেদিন কোর্টে উদ্ধববাবু যখন মামলার কাজে ব্যস্ত, সে-সময় একজন পেয়াদা এসে তাকে একটা হাতচিঠি দিয়ে বলল, "বাইরে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। জবাব নিয়ে যাবে।"

উদ্ধববাবু ভ্রূকুটি করে বললেন, "এখন সময় নেই। পরে আসতে বল।"

পরে ভেবে দেখলেন, মোকদ্দমার ব্যাপারে কোনো মক্কেল কোনো পয়েন্ট দিয়ে থাকতে পারে। তাই পেয়াদাকে বারণ করে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন?

মাননীয় মহাশয়,

কিছুকাল পূর্বে আমার পোষা কাকাতুয়াটি বাড়ির লোকের অসতর্কতার সুযোগে উড়িয়া যায়। পাখিটি আমার অত্যন্ত আদরের। বহু জায়গায় অনুসন্ধান করিয়া এতকাল তাহার কোনো খবর পাই নাই। সম্প্রতি জানিতে পারিলাম, ঐ কাকাতুয়াটিকে আপনি কোনো পাখিওলার কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এখন আপনার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ, দয়া করিয়া কাকাতুয়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করুন। আপনি টাকা খরচ করিয়া কিনিয়াছেন, তাই আপনার অর্থক্ষতি হউক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। পত্রবাহকের সঙ্গে টাকা আছে। ন্যায্য দাম লইয়া আপনি পাখিটি তাহার হস্তে দিলেই হইবে। পত্রবাহকটি জন্ম হইতেই মূক ও বধির। তাহার সহিত বাক্যালাপ করা নিষ্প্রয়োজন। কিছু জানিবার থাকিলে আপনি তাহার হাতে পত্রও দিতে পারেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি ভবদীয়-শ্রীশচীলাল শরমা।

চিঠি পড়ার পরও উদ্ধববাবু ভূকুচকেই ছিলেন। তিনি উকিল মানুষ, সুতরাং একটা সন্দেহবাতিক আছে। কোনো ঘটনাকেই সরলভাবে বিশ্বাস করেন না, যুক্তি দিয়ে সম্ভাব্যতা দিয়ে বিচার করে দেখেন। তিনি একটি চিরকুটে লিখলেন?

মাননীয় শচীলালবাবু,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি সাতিশয় অবাধ্য ও জেদি। আজ পর্যন্ত তাহাকে মনোমত বুলি শিখাইতে পারি নাই।

পাখিটি যদি আপনার হয় তবে ফেরত দিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিব না, তবে দুনিয়ায় লক্ষ-লক্ষ কাকাতুয়া আছে। এই অঞ্চলেই কয়েকশো লোকের পোষা কাকাতুয়া আছে বলিয়া জানি। এখন আমার ক্রীত কাকাতুয়াটিই যে আপনার নিরুদ্দিষ্ট কাকাতুয়া, তাহার প্রমাণ কী? যদি অকাট্য প্রমাণ দেন তাহা হইলেই বুঝিব যে, আপনার নিরুদ্দিষ্ট এবং আমার ক্রীত কাকাতুয়াটি এক ও অভিন্ন। পাখিটি কিনিতে আমার দুইশত টাকা খরচ পড়িয়াছে। মাসখানেক তাহার খোরাকিবাবদ খরচ হইয়াছে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। কাকাতুয়াটি বেশ ভালমন্দ খাইতে পছন্দ করে। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন।

ইতি ভবদীয়-উদ্ধবচন্দ্র ভট্টাচার্য।

পেয়াদার হাত দিয়ে চিরকুটটা পাঠিয়ে উদ্ধববাবু আবার মোকদ্দমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘটনাটা আর মনেই রইল না।

উদ্ধববাবুর বাড়ির সব কাজের কাজি হল নয়নকাজল। ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আছে। ঘরের সব কাজ জানে। এমনকী, মোকদ্দমার ব্যাপারে উদ্ধববাবুকেও নাকি কখনো-সখনো পারমর্শ দেয়। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচেই। তবে তার চালচলন বুড়ো মানুষের মতো ভারিক্কি হওয়ার জন্য সে চোখে একটা চশমা পরে।

দুপুরে কাকাতুয়াটাকে ঝাঁঝরি দিয়ে ভাল করে স্নান করাল নয়ন। বাইরের বারান্দায় শীতের রোদে দাঁড়টা ঝুলিয়ে দিল। তারপর চোখে চশমা এঁটে খবরের কাগজ খুলে পড়তে বসল। ঠিক এমন সময় বিশাল এক সাধু এসে হাজির। পরনে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল, ডমরু, কপালে ত্রিপুণ্ডক, মাথায় জটা, বিশাল ভূঁড়ি, পেল্লায় দাড়ি গোঁফ, হুহুংকার দিল– হর হর ব্যোম ব্যেম....। হর হর ব্যোম ব্যোম....হর হর ব্যোম ব্যোম.... . ”

সেই হুংকারে আতকে উঠল নয়ন। এ শহরটা ছোটো বলে সাধু ভিখিরি সবই সকলের চেনা। কিন্তু এই বিকট সাধুকে আগে কখনো দেখা যায়নি।

চশমার ভিতর দিয়ে (যদিও চশমার কাঁচে কোনো পাওয়ার নেই) খুব গম্ভীর ভাবে সাধুকে লক্ষ করে নয়ন বলল, “কোত্থেকে আসা হচ্ছে?”

সাধু কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে জমিয়ে বসে বলে, “সোজা হিমালয় থেকে। দেড় হাজার মাইল হাঁটাপথ। ওফ, একটু জল খাওয়াও তো বাপু মায়াবদ্ধ জীব।”

‘মায়াবদ্ধ জীব’ বলে এ পর্যন্ত কেউ সম্বোধন করেনি নয়নকে। সে খানিকটা থতমত খেয়ে বলে, “শুধু জল?”

সাধু হা-হা করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে ওঠে হঠাৎ। বলে, “আরে জলই তো হাতের গুণে অমৃত হয়ে যাবে। আনো দেখি ঘটিভর।”

সেই হাসি শুনে নয়নের খুব ভক্তি হল। তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল নিয়ে এল সে।

সাধু দু’হাতে ঘটি ধরে উঁচু থেকে গড়গড় করে জল ঢালল গলায়। ঘাবুত-ঘুবুত করে খানিক গিলে ঘটিটা ফেরত দিয়ে বলল “নে, পেসাদ খা।”

নয়ন ঘটিটা মাথায় ঠেকিয়ে সেটা আলগা রেখে গলায় জল ঢেলেই চমকে ওঠে। জল কোথায়? এ যে খাঁটি কমলালেবুর রস!

ঘটি রেখে নয়ন উপুড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করে বলল, "আমাকে দয়া করতে হবে, বাবা।"

সাধু তার মাথায় প্রকাণ্ড হাতের একটা থাবড়া মেরে বলে, "হবে হবে। এই যে সিকি ঘটি অমৃত খেলি, এর ঠেলাটাই আগে সামলা।"

নয়নকাজল অবাক হয়ে বলল, "এই কি অমৃত, বাবা?"

"তাহলে কী?" সাধু কটমট করে তাকিয়ে বলে।

আমতা-আমতা করে নয়ন বলে, "না, অমৃতই হবে। খাওয়ার পর থেকে গায়ে একটু জোরও পাচ্ছি যেন। তবে কিনা খেতে একেবারে কমলালেবুর রসের মতো। "

"দূর বেটা খণ্ডিত সত্তা, তোরা হলি সংসার-পুকুরের মাছ। অমৃতের স্বাদ কি একেবারে পাবি? তবু তো তোর কমলালেবুর রস বলে মনে হয়েছে, অনেকের আবার ডাবের জল বা এমনি জল বলে মনে হয়েছে। তারা ঘোর পাপী, ঘোর পাপী, ব্যোম ব্যোম হর হর..."

নয়ন আর একবার সাধুকে প্রণাম করে।

সাধু কাকাতুয়ার দাঁড়টার দিকে তাকিয়ে ফেঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে "নিজেরা হাজারো মায়ায় আটকে ছটফট করছিস তার ওপর ঐ অবোলা জীবটার পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিস! ঘোর নরকে যাবি।

"আমি নই বাবা! ও হল কর্তাবাবুর পাখি। আমি সামান্য চাকর।

"যে বেটা নিজেকে চাকর ভাবে, সে তো আগাপাশতলা চাকরই। নিজেকে চাকর ভাবিস কেন? তুই তো মুক্ত আত্মা। এ-বাড়ি এ-সংসার এ-দুনিয়ার সব কিছুর মালিক। যা বেটা ছেড়ে দে পাখিটাকে যা যা, ওঠ, দেরি করিসনি।"

নয়ন ভয়ে-ভয়ে উঠে পড়ে বলে, "কিন্তু বাবা, কর্তাবাবু রাগী লোক। ফিরে এসে পাখি না দেখলে এমন কুরুক্ষেত্র করবে!"

চোখ পাকিয়ে সাধু হুহুংকার দিয়ে ওঠে। "হর হর ব্যোম ব্যোম....কে তোর কেশাগ্র স্পর্শ করবে রে বেটা? এইমাত্র অমৃত খেলি যে! যা বেটা, ছেড়ে দে, একটা মুক্ত আকাশের জীবকে আর কষ্ট দিসনে। ছেড়ে দে, উড়ে যাক।"

নয়নকাজল সাধুর হুংকারে মনস্থির করতে না-পেরে দোনোমোনো হয়ে উঠে পড়ল। দাঁড়ের কাছে গিয়ে শিকলিটা খুলতে সবে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় আর-একটা লোক বারান্দায় উঠে বিকট গলায় বলে উঠল, "কাকাতুয়ার

মাথায় ঝুঁটি, খ্যাকশিয়ালি পালায় ছুটি.....।

নয়নকাজল এই দু নম্বর চেঁচানিতে ঘাবড়ে গেল। শিকল আর খোলা হল না। তাকিয়ে দেখল, মূর্তিমান গবা পাগলা।

গবা খুব সরু চোখ করে আপাদমস্তক সাধুকে দেখে নিচ্ছিল। ভাল করে দেখে-টেখে বলল, "সব ঠিক আছে। তবে বাবু, তোমার একটা ভুল হয়েছে। গায়ে ছাই মাখোনি।"

সাধু একটু হতভম্ব। কথা সরছে না। তবু একবার রণহুংকার দিল, "হর হর ব্যোম ব্যোম....."

গবা সেই হুংকারে একটুও না ঘাবড়ে বলে, "পায়ে বাটা কোম্পানির চটি জোড়াও মানায়নি একদম। একজোড়া কাঠের খরম যোগাড় করতে পারোনি হে?"

সাধু এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "হর হর....."

গবা সাধুর বাঁ হাতটা তুলে কবজিটা দেখে নিয়ে বলে, "এ যে ঘড়ি পরার স্পষ্ট দাগ গো! রোজ ঘড়ি পরো বুঝি হাতে? সাধুরা আজকাল ঘড়িও পরেছ তাহলে? তা সেটা রেখে এলে কোথায়?"

সাধু ত্রিশূলটা শক্ত করে চেপে ধরে ধমক দেয়, "ব্যোম ব্যোম..."

গবা ফিক করে হেসে বলে, "বোমা কেন? পিস্তল নেই? বোমার চেয়ে পিস্তল ভাল। বোমা অনেক সময় ঝোলার মধ্যে ফেটে টেটে যেতে পারে।"

সাধু এক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "ঘোর পাপী, ঘোর পাপী। অন্ধকারে ডুবে আছিস।"

পাখিটা অনেকক্ষণ ধরে সাধুকে ঘাড় কাত করে করে দেখছিল আর দাঁড়ে এধার-ওধার করছিল। এখন একটা ডিগবাজি খেয়ে বলল, বিশু, বিশু, আমারা কেন ঘুম পাচ্ছে! ঘুম পাচ্ছে! আলমারিতে টাকা নেই। টাকা আছে....."

সাধু হঠাৎ একটা লাফ মেরে বারান্দায় উঠে দাঁড়টাকে একটা ঝাঁকুনি মেরে বলে, "বল বেটা কোথায় আছে! বল নইলে গলা টিপে খুন করে ফেলব।"

পাখিটা হঠাৎ কঁকনি খেয়ে বুলি ভুলে ডানা ঝাঁপটে ভয়ে চিৎকার করতে লাগল।

.

০৩.

সাধুর কাণ্ড দেখে নয়নকাজলের বাকি সরে না, হাত-পা নড়ে, শরীরে সাড়া নেই। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। মুখোনা হাঁ। পাখিটা বুলি ভুলে গাঁ গাঁ করে প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে আরদাঁড়ে বনবন করে ডিগবাজি খাচ্ছে। বিটকেল গলায় সাধু বলছে, "বল বেটা বল কোথায় টাকা! বল!"

অবস্থা যখন এইরকম গুরুচরণ, তখন হঠাৎ-জলের চৌবাচ্চায় নেমে বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কার করার পর যেমন ইউরেকা ইউরেকা' বলে আওয়াজ ছেড়েছিলেন-তেমনি গবা পাগলা লাফিয়ে উঠে দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগল' চিনেছি! চিনেছি! সাধুকে চিনেছি!"

যেই না চেঁচানো সেই না সাধু চোখের পলকে লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে হাওয়ার বেগে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

নয়নকাজল ধাতস্থ হয়ে গবাকে জিজ্ঞেস করে, "বিটকেল সাধুটাকে চেনো হলে! কে বলো তো?

গবা বসে-বসে ঘাম মুখের ধুলো-ময়লা মুছছিল। বিজ্ঞের মতো হেসে বলল, "বলব কেন? ডবল লেন্স লাগিয়ে নতুন ধরনের একটা টর্চবাতি বানাব বলে তোমার কাছে যে গতকাল বাবুর মায়ের পুরনো চশমাজোড়া চাইলাম, দিয়েছিলে?"

নয়ন একটু তেড়িয়া হয়ে বলে, "আর চোর বলে যদি আমার বদনাম রটত? তখন তুমি কোথায় থাকতে?"

"চোর!" বলে হোঃ হোঃ করে হাসে গবা, "চোর বুঝি এখন নও? কুন্দ দারোগাকে যদি তোমার আসল নামটা জানাই তাহলে তুমি এরকম সুখে আর থাকবে না হে! "

একথা শুনে নয়ন কেমন একধারা হয়ে গেল। মুখোনা ছাইবর্ণ, চোখে জুলজুলে চাউনি।

গবা অবশ্য আর ঘাটাল না। বলল, "নাও, মেলা বেলা হয়েছে, পাঁচক ঠাকুরকে আমার খাবারটা বাড়তে বলো গে।"

নয়নকাজল মিনমিনে গলায় বলল, "যাচ্ছি। কিন্তু কথাটা হল–"

গবা হাত তুলে বলে, "বলতে হবে না। কথাটা আপাতত চাপা থাকবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে যাও। আর শোনো, পাখিটাকে ভিতরের দরদালানে ঝুলিয়ে রেখো, যখন-তখন বের কোরো না, এটার ওপর কিছু লোকের চোখ আছে।"

নয়নকাজল দাঁড়টা নিয়ে ভিতরবাড়িতে চলে গেল।

এ-বাড়িতে গবা পাগলার আস্তানা বহুদিনের। মাঝেমধ্যে সে দু-চার ছ মাসের জন্য হাওয়া হয়ে যায় বটে, কিন্তু ফিরে এসে বাইরের পাকা চণ্ডীমন্ডপের পাশে রসুইখানার ঘরটায় বরাবরের মতো থানা গাড়ে। তাকে কেউ কিছু বলে না। শোনা যায় উদ্ধববাবু গবাকে একটা বিচ্ছিরি মামলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। বহুকাল আগেকার কথা। সত্যি-মিথ্যে কেউ বলতে পারেনা।

গবা পিছনের পুকুর থেকে স্নান করে এসে এক পেট খেয়ে ঘুম লাগাল।

বিকেল হতে না হতেই রামু এসে ঠেলে তুলল, "ও গবাদা! বাবাকে বলে বিষ্ঠুপুরের সারকাসে নিয়ে যাবে বলেছিলে যে! আজই চলো।"

গবা হাই তুলে বলে, দূর! ও একটা সারকাস নাকি? মরকুটে বাঘ,

রোগা হাতি, পালোয়ানের নেই বুকের ছাতি। কাল সকালে গিয়ে দেখি, সরকাসের ম্যানেজার গুণঘঁচে পাটের ফেঁসে ভরে ছেঁড়া তবু সেলাই করছে। তার চেয়ে হবিগঞ্জের সারকাস অনেক ভাল।"

"কী আছে তাতে?"

"ওঃ, সে মেলা জিনিস। বাঘ হাতি সিন্ধুঘোটকের কথা ছেড়েই দিলাম। একটা বেঁটে লোক আছে, সে ভারী হাসায়। বেঁটেটার বন্ধু হচ্ছে একটা তালগাছের মতো লম্বা লোক। তা বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় বেঁটেটা একটা মই লাগিয়ে বন্ধুর কাধ-বরাবর উঠে যায়। মজা না?"

"খুব মজা। কিন্তু কবে নিয়ে যাবে?"

"ব্যস্ত হয়ো না বাবুমশাইকে বলে আগে অনুমতি নিই। তারপর একদিন যাব'খন। পয়সা-টয়সাও লাগবে না। হাবিবগঞ্জের সারকাসের সেই বেঁটে লোকটা আমার খুব বন্ধু। দুজনে একসময়ে একই দলে ছিলাম কিনা।"

রামু চোখ কপালে তুলে বলে, "তুমি সারকাসের দলে ছিলে গবাদা? বলোনি তো?"

গবা মৃদু-মৃদু হেসে বলে, "সারকাসে ছিলাম, বেদের দলে ছিলাম। সে অনেক ঘটনা।"

"সারকাসে কী কী খেলা দেখাতে?"

"সবরকম। ট্রাপিজ, দড়ির ওপর হাঁটা, একচাকার সাইকেলে উঠে রকম রকম কসরত, ক্লাউন সেজে রগড়ও করতে হয়েছে।

'আমাকে খেলা শিখিয়ে দেবে?"

"তা আর শক্ত কী? তবে কঠিন ডিসিপ্লিন চাই, মনোযোগ চাই অধ্যবসায়। চাই।"

"আমি পারব।"

উদ্ধববাবু আজ একটু তাড়াতাড়িই কাছারি থেকে ফিরে এসেছেন। এসেই হাঁক মারলেন, "নয়ন, ওরে নয়ন!"

নয়নকাজল ছুটে এসে বলে, "আজ্ঞে বাবুমশাই।"

"পাখিটা কোথায়?"

"দরদালানে ঝোলানো আছে।"

"হুঁ" বলে উদ্ধববাবু পকেট থেকে শচীলাল শর্মার চিঠিটা বের করে আর একবার পড়লেন। তারপর ভ্রু কুঁচকে বললেন "পাখিটাকে খুব সাবধানে রাখা দরকার। আজ থেকে ওটাকে এ-ঘরে রাখবি। আমি না থাকলে দরজায় সবসময় তালা দেওয়া থাকবে বুঝেছিস?"

"আজ্ঞে।" নয়নকাজল খুব বিনীতভাবে বলল, তবে এসময় উদ্ধববাবু লক্ষ করলে দেখতে পেতেন যে, নয়নকাজলের চোখ দুটো চকচক করছে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে নয়ন বলল, "আজ এক বিটকেল সাধু এসে পাখিটার ওপর খুব হামলা করে গেছে। নিয়েই যেত, আমি গিয়ে সময়মতো আটকালাম বলে।"

"সাধু!" বলে উদ্ধববাবু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন, "সাধুর সঙ্গে পাখির কী সম্পর্ক?"

মাথা চুলকে নয়ন বলে, "আজ্ঞে সে তো জানি না"।

উদ্ধববাবু রেগে গিয়ে বলেন, "এবাড়িটা কি হাট নাকি? যে-কেউ এসে ঢুকে পড়বে, হামলা করবে, তোরা সব করিস কী? সাধু পাখিটা নিয়ে যাচ্ছিল নাকি?"

"তাই মতলব ছিল। বিশাল চেহারা দেখলেই ভয় হয়।"

"ধরতে পারলি না?"

"ও বাবা, ধরবে কে? হাতে যা একখানা ধারালো শূল ছিল!"

উদ্ধববাবু একটু চিন্তিত মুখে বললেন, "ঠিক আছে, এখন থেকে সাবধান থাকবি।"

বাইরের কাছারি ঘরে মক্কেলরা জড়ো হতে শুরু হয়েছে। কাজেই পাখি নিয়ে ভাববার সময় উদ্ধববাবুর নেই। তিনি তৈরি হয়ে কাছারিঘরে গিয়ে বসলেন এবং মামলামকদ্দমার মধ্যে ডুবে গেলেন।

সন্ধের সময় যখন সবাই পড়তে বসে তখনই রামুর ভীষণ ঘুম পায়। এত ঘুম যে কোথায় থাকে? কেবল হাইয়ের পর হাই উঠতে থাকে, চোখের দুটো পাতায় যেন আঠা-মাখানো চুম্বক লাগিয়ে দেয় কে। শ্রীধর মাস্টারমশাই পড়াতে এসে ভীষণ রাগারাগি করেন রোজ। মারধরও প্রায় রোজই খেতে হয় রামুকে। কিন্তু পড়তে তার একদমই ভাল লাগে না।

আজও তিন ভাই পড়তে বসেছে। রামু ঘন ঘন দেওয়ালঘড়িটার দিকে চাইছে। ঠিক ছটায় শ্রীধরবাবু আসবেন। ততক্ষণ যতটা পারে ঢুলে নেওয়ার জন্য সে মুখে অ্যাটলাসটা চাপা দিয়ে চোখ বুজে রইল।

কিন্তু কে জানে কেন আজ রামুর ঘুম আসছিল না। বারবারই তার চোখে একটা সারকাসের দৃশ্য ভেসে উঠছে, সে দেখছে, একটা ছেলে ট্রাপিজ থেকে আর একটায় ঝাঁপ দিয়ে চলে যাচ্ছে, দড়ির ওপর হাঁটছে। একচাকার সাইকেল কসরৎ দেখাচ্ছে। ছেলেটা অবশ্য সে নিজেই। আজ তার মনে হল, সারকাসের খেলোয়াড় হতে না পারলে জীবনের কোনো মানেই নেই।

এদিকে ছটা বেজে গেল। ক্রমে সাড়ে ছটাও বাজে। কিন্তু শ্রীধরবাবু এলেন না। এরকম অঘটন কখনোই ঘটে না, শ্রীধরবাবুর মতো নিয়মনিষ্ঠ লোক কমই আছে। কামাই তো নেইই, এ মিনিট দেরিও করতে নারাজ। আজ তবে হল কী?

সন্ধে সাতট নাগাদ কাছারিঘরে উদ্ধববাবুর কাছে একটা লোক এসে বলল, “শ্রীধরবাবু সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে পা মচকেছেন। ক’দিন আসতে পারবেন না।”

মামলা-মকদ্দমায় ডুবে-থাকা উদ্ধববাবু অবাক হয়ে বললেন, “কে শ্রীধরবাবু? কিসের মামলা?”

“মামলা নয়। শ্রীধরবাবু আপনার ছেলেদের পড়ান।”

“অ, তা কী করে পড়লেন?”

“সাইকেলে টিউশানি করে আসছিলেন এমন সময় একটা মোটর সাইকেল এসে তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। খুব চোট হয়েছে। ডান পায়ের হাড় সরে গেছে।”

“তাই তো! খুব দুঃখের কথা।”

পরদিন সকালেই অবশ্য শ্রীধরবাবু চিঠি দিয়ে একটি লোককে পাঠালেন। চিঠিতে লেখা, "আমার বদলে এই ভ ভদ্রলোক ছেলেদের ক'দিন পড়াবেন। ইনি তিনটি বিষয়ে এম. এ. পাস।"

উদ্ধববাবুর আপত্তির কারণ ছিল না। শ্রীধরবাবু যাকে পাঠিয়েছেন তার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্নই ওঠে না। লোকটির চেহারাও বেশ ভালমানুষের মতো। নাম যুধিষ্ঠির রায়। আগে এঁকে কখনো দেখেন নি উদ্ধববাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি এই অঞ্চলের লোক?"

"এই অঞ্চলেরই। তবে পড়াশুনো করতে অনেকদিন বাইরে ছিলাম।"

"ঠিক আছে। আজ থেকেই শুরু করুন।"

রাত্রিবেলা চুপিসারে নয়নকাজল একটা লুচি খাওয়াল কাকাতুয়াটাকে। তারপর বেশ মিষ্টি করে পাখিটার গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি! সেই টাকাটার কথা, না? কোথায় যেন আছে সেই টাকাটা? বল বাবা।"

পাখিটা ঘাড় বেঁকিয়ে নয়নকাজলকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "টাকা নয়, মোহর। মোহরগুলো....মোহরগুলো.... . । "

নয়নকাজল সাপর মতো চোখ করে চেয়ে ছিল পাখিটার দিকে। সাপের মতো গলাতেই বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ মোহর। তা সে মোহরগুলো কোথায় রে বাপ?"

"মোহর আছে...মোহর আছে....মাটির তলায়.....কিন্তু বিশু, তুমি অমন করে তাকিও না.....আমি ভয় পাই.....ভয় পাই।"

চাপা গলায় নয়নকাজল বলে, "ভয় নেই রে! মাটির তলায় তো বুঝলুম, কিন্তু জায়গাটি কোথায়? ||||||||| পাখিটা দাঁড়ে দোল খেতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাঃ হাঃ হাসির শব্দ তুলে বলল "জানি, কিন্তু বলব না।"

"বলবি না? বলবি না?" বলতে বলতে নয়নকাজল দুটো হাত সাঁড়াশির মতো করে পাখিটার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। পেছনে কখন নিঃশব্দে রামু এসে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্যটা দেখে সে অবাক! কিন্তু বিপদ বুঝে সে হঠাৎ বলে উঠল, "নয়নদা। কী হচ্ছে?"

নয়নকাজল চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে একগাল হেসে বলল, "পাখিটাকে বড়বাবুর ঘরে রেখে আসার হুকুম হয়েছে কিনা। তাই দাঁড়টা নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

কথাটা রামুর বিশ্বাস হল না। কিন্তু আর কিছু বলল না সে। তবে পাখিটা যে মোহরের কথা বলছিল, তা সে স্পষ্ট শুনেছে।

রামু যে খুবই দুষ্টু ছেলে সে, নিজেও জানে। একবার স্কুলের অঙ্ক স্যার হেরম্ববাবু রেগে গিয়ে তাকে বলেছিলেন "তুই এত পাজি কেন বল তো?"

"আজ্ঞে স্যার, আমার শরীরের মধ্যে সবসময় কে যেন কাতুকুতু দেয়। যখন খুব কাতুকুতুর মতো লাগে, তখন আমার কিছু একটা না করলে চলে না।"

"বটে!" বলে হেরম্ববাবু খুব রেগে গেলেন। রামু ইয়ার্কি করছে ভেবে শপাং শপাং কয়েক ঘা বেতও বসালেন তার গায়ে। তারপর বললেন, "এবার কাতুকুতু টের পাচ্ছিস?"

কিন্তু ইয়ার্কি রামু করেনি। বাস্তবিকই তার শরীরের মধ্যে সবসময় একটু কাতুকুতুর ভাব। কখনো বাড়ে, কখনো কমে। যখন বাড়ে তখন বেহদ্দ কোনো দুষ্টুমি না করলেই নয়। খাঁ-খাঁ দুপুরে সে তখন এলোপাথাড়ি ঢিল ছোঁড়ে, গাছের মগডালে ওঠে, ক্লাসে অন্য ছেলেদের বই খাতা গোপনে ছিঁড়ে রাখে, ক্লাসঘরে ছাগল ঢুকিয়ে দেয়, বাড়িতে রান্নাঘরে গিয়ে রান্না তরকারির মধ্যে নুন ছিটিয়ে দিয়ে আসে। প্রতিবেশীরা তার উৎপাতে অস্থির। রামুর মেজদাদুর সত্তর বছর বয়সেও সটান চেহারা সবকটা দাঁত অটুট, মাথায় কালো কুচকুচে চুল। সেবার মেজদাদু রামুদের বাড়ি বেড়াতে এসে বললেন, "আমার মাথা থেকে পাকা চুল বের করতে পারবি? পার পাকাচুল চার আনা করে পয়সা দেব।"

.

০৪.

দুপুরে খাওয়ার পর মেজদাদু যখন শুয়েছেন তখন রামু চুল বাছতে গেল এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রায় শ'খানেক পাকা চুল বের করে ফেলল। দেখে মেজদাদু তে মূর্ছা যান আর।

কী! বাড়ি মাথায় করে চেঁচাতে থাকেন, "ভৌতিক কাণ্ড! ভোতক কাণ্ড! আমি কি রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেলুম! ওরে উদ্ধব, শিগগির ডাক্তার ডাক। আমার বুকটা কেমন করেছে, মাথা ঘুরছে, হাত পা কাঁপছে!"

ঠিক সেই সময়ে প্রতিবেশী জামাল সাহেব তার সাদা ধবধবে বিলিতি কুকুরটাকে চেন দিয়ে বেঁধে এনে বাড়িতে ঢুকলেন। দুঃখ করে বললেন, "রেমোর কাণ্ড দেখুন একটু আগে আমার বাসায় গিয়েছিল, হাতে একটা কাচি। কুকুরটাকে খুব আদর করছিল তখন কি ছাই টের পেয়েছি! এখন দেখি পিঠের লম্বা চুলগুলো কেটে একেবারে টাক ফেলে দিয়ে এসেছে।"

বাস্তবিকই তাই। সুন্দর, বড় বড় লোমওয়ালা কুকুরটার পিঠ প্রায় ফাঁকা। উদ্ধববাবু হান্টার বের করলেন, মেজদাদু তখন গিয়ে তাকে আটকে দিয়ে বললেন, "যাই হোক বাবা, মাপ করে দাও। ছেলেমানুষ।"

মেজদাদু যে বাস্তবিকই বুড়ো হননি সেটা জেনেই তিনি তখন খুশি। তবে তার পরেও দিন-দুই তার চুল থেকে কুকুরের সাদা লোম ঝরে পড়ত।

শরীরের এই কাতুকুতুটা নিয়ে রামু মাঝেমাঝে ভাবে। কে যে তাকে কাতুকুতু দেয়! ব্যাটাকে ধরতে না পারলে কিছুতেই আর ভাল ছেলে হওয়া যাবে না।

অবশ্য ভাল ছেলে হওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছেও তার হয় না। আর ইচ্ছে করে সারকাসের রিং-মাষ্টার বা ম্যাজিসিয়ান বা প্রেসিদ্ধ তান্ত্রিক বা নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় বা রেলের গার্ড বা মহাকাশচারী বা বহুরূপী বা বিশ্বভ্রমণকারী বা ট্রাক ড্রাইভার বা পাইলট বা ডুবুরি হতে। শুধু লেখাপড়া করে আর নিয়মমতো চলে এর কোনোটাই হওয়া যাবে না। সুতরাং সে ঠিক করেছে, একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। কুমোরপাড়ার গারও পালানোর হচ্ছে। দুজনে প্রায়ই শলাপরামর্শ করে। গান্টুর ইচ্ছে পালিয়ে প্রথমেই উত্তরমেরুতে যাবে। রামুর ইচ্ছে, আফরিকা। দুজনে এখনো একমত হতে পারেনি। হলেই গলা-জড়াজড়ি করে একদিন বেরিয়ে পড়বে।

তবে রামু দুষ্টু হলেও সে গাছপালা আর পশুপাখি খুব ভালবাসে। এমন কী, নিজেদের বাগানের সব কটা গাছের সঙ্গেই তার আলাদা আলাদা রকমের সম্পর্ক আছে। বুড়ো তেঁতুলগাছটার সঙ্গে তার সম্পর্ক দিদিমা আর নাতির। তেঁতুলগাছটাকে সে তিন্তিড়ি দিদিমা বলে ডাকেও। গাছটা যে তাতে সাড়া দেয়, তাও সে টের পায়।

কমেলর আমগাছটা ভাল-ছেলে ধরনের। প্রতি বছর আঁকা ঝকা আম ফলে তাতে,। কাজের লোক, কিছু গম্ভীরও। তাকে রামু গোপালদা বলে ডাকে। রামুর ক্লাসের ফাওঁবয়ের নামও গোপাল, আর গাছটাও গোলাপ-খাস আমের। তবে ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে রামুর ভাব নেই, গাছটার সঙ্গে আছে। একটু বর্ণ বিপর্যয় করে নিয়ে গোলাপখাসকে গোপালদা বানিয়ে নিতে রামুর অসুবিধে হয়নি।

এছাড়া কাক, শালিখ, চড়াই, বেড়াল, কুকুর, ইঁদুর, এমনকী কাঠবেড়ালিদের সঙ্গেও রামুরর কোনো শত্রুতা নেই। তারা রামুকে পছন্দই করে। বাড়ির পোষা পায়রাগুলো রামুর মাথায়, কাঁধে নির্ভয়ে এসে বসে। কাঠবেড়ালি তার থেকেই চিনে-বাদাম খেয়ে যায়। গোট চারেক চেনা শালিখ রোজ সকালে পড়ার ঘরে ঢুকে কিচির-মিচির করে তাদের পড়া ভণ্ডুল করে রামুকে সাহায্য করার চেষ্টা করে।

নয়ন পাখির দাঁড়টা বাবার ঘরে দিয়ে আসতে চলে যাওয়ার পর রামুর মনে হল, এই কাকাতুয়াটাকে হাত করা দরকার। বাবা এটাকে কিনেছে রামুকে ঢিট করবার জন্যই। পাখিটাকে হাত না করলে ব্যাটা তাকে বিস্তর জ্বালাবে।

উদ্ধববাবু মক্কেলদের বিদায় করে খাওয়া দাওয়া সেরে যখন ঘরে এলেন তখন অনেক রাত। পাখির দাঁড়টা সিলিং ফ্যান থেকে ঝোলানো একটা দড়িতে বাঁধা। কাকাতুয়া ঘাড় গুঁজে ঘুমোচ্ছে। উদ্ধববাবু নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু মাঝরাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। না, দুঃস্বপ্নটা ঠিক দেখেননি তিনি। বরং বলা যায় একটা দুঃস্বপ্ন তিনি শুনলেন। কে যেন বলছে, "ওরে বাবা! কী ভয়ংকর! কী সাংঘাতিক রক্ত! রক্ত!"

এইসব বিদঘুঁটে কথা-শুনে ঘুম ভেঙে গেল। উদ্ধববাবু উঠে বসলেন। তার শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। তবু চেঁচিয়ে বললেন, "কী হয়েছে রে? ডাকাত পড়ল নাকি?"

না, ডাকাত পড়েনি। হতচ্ছাড়া সেই পাখিটা। চালের এধারে-ওধারে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। পায়ের সরু শিকলের শব্দ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, ঘোর শীতকালেও সিলিং ফ্যানটা বাই বাই করে ঘুরছে। সেই সঙ্গে পাখির দাঁড়টাও।

কে পাখা খুলল? কেন খুলল? পাখিটাই বা ওরকম চেঁচাল কেন? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না।

উদ্ধববাবু উঠে পাখাটা বন্ধ করলেন। পাখিটা খুব কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকে একবার দেখল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, "সাবধান!"

উদ্ধববাবু আর বাকি রাতটা ঘুমোতে পারলেন না। ঠিক করলেন, পাখিটাকে শচীলাল শরমার কাছে বেচেই দেবেন। না হয় তো অন্য কাউকে। বড্ড ঝামেলা।

.

০৫.

দুপুরবেলা বহু দূর থেকে একটা লোক পশ্চিমের চষা খেতের মত্ত মাঠটা পেরিয়ে শহরের উপকণ্ঠে শালবনটার ভিতরে ঢুকল। ঝরা পাতার বনটায় আলোছায়ার চিকরি-মিকরি। গোঁ-গোঁ করে

উত্তরে শীতের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো শুকনো পাতা খসে পড়ছে। লোকটা কাধ থেকে তার খাকি রঙের ব্যাগটা নামিয়ে গাছতলায় রাখল।

তার ব্যাগটা দেখেই বোঝা যায়, লোকটা পর্যটক। তার গালে বেশ ঘন দাড়ি আর গোঁফ। খুব লম্বা নয়, কিন্তু শক্ত মজবুত চেহারা, পরনে মালকোচা মারা ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া আর মোটা সুতির চাঁদর। কাঁধে একটা ভাঁজ করা কুটকুটে কম্বলও আছে। পায়ে খুব পুরু সোলের নাগরা জুতে। হাতে বেতের একটা লাঠি। বয়স বাইশ-তেইশ বা বড়জোর পঁচিশ পর্যন্ত হতে পারে। চোখ দুখানায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। রোদে-জলে ঘুরে-ঘুরে গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে বটে, তবে একসময় সে খুব ফর্সা ছিল তা বোঝা যায়।

লোকটা খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। তার পর ব্যাগ থেকে চিড়ে আর গুড় বের করে কয়েকটা শালপাতা বিছিয়ে তার ওপর ঢাকল। সামনেই মটর খেত। উঠে গিয়ে খেত থেকে তাজা মটরশুটি তুলে আনল এক কোঁচড়। জলও জুটে গেল কাছেই এক চাষীবাড়ির কুয়ো থেকে। কোথায় কী জোটে তা লোকটা ভালই জানে।

খাওয়ার পর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে লোকটা অঘোরে ঘুমোতে লাগল। জঙ্গলে সাপখোপ, পাগলা শেয়াল থাকতে পারে। শীতকালে এই অঞ্চলে চিতাবাঘও হানা দেয়। লোকটা সবই জানে, কিন্তু সূক্ষেপ নেই।

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে পশ্চিমের মাঠে সূর্য টুক করে মেঘলা মতো একটা কুয়াশার স্তরের মধ্যে ডুবে গেল। শালবনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠল অন্ধকার। আর হাড়-কাঁপানো হিম একটা হাওয়া হুঁ-হুঁ করে বইতে লাগল।

লোকটা চোখ মেলে তাকায়। সে দিনের বেলায় বড় একটা লোকালয়ে ঢুকতে চায় না। চারদিকটা বেশ আঁধারমতো হয়ে এসেছে দেখে লোকটা তার ব্যাগ-ঠ্যাগ গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল।

বন পার হয়ে লোকটা কিন্তু শহরে ঢুকল না। শহরের বাইরে মস্ত সার্কাসের তবু পড়েছে। ডিম-ডিম করে বাজনা বাজছে। বাঘ সিংহের হুংকার শোনা যাচ্ছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। চারিদিকে আলো ঝলমল দোকানপাট, বেলুনওয়ালা, ভেঁপুওয়ালা বাঁশিওয়ালা মিলে এক মেলা বসে গেছে।

লোকটা মোটা চাঁদরে নাক পর্যন্ত ঢেকে আর মাথায় একটা কপাল ঢাকা বাঁদুরে টুপি চাপিয়ে একটু সন্তর্পণে তাবুর পিছন দিকে এগোতে লাগল।

এ-পাশটা অন্ধকার। বাঘ সিংহের খাঁচা, রসুইখানা, খেলোয়াড়দের তাবু আর মেলা, দড়ি-দড়া, বাঁশ-কাঠ, প্যাকিং বাক্সের গাদা। লোকটার কোনো অসুবিধে হল না অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেল।

খেলোয়াড়দের ঢুকবার দরজায় কড়া পাহারা, খুব কম করেও পাঁচ-সাতজন মুশকো লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। খেলা শুরু হতে আর দেরি নেই। দরজার কাছে একটি আলোর চৌখুপি। মুখটকা লোকটা এগিয়ে যেতেই পাহারাদাররা পথ আটকাল, “এই এধারে যাওয়া বারণ। হঠো, হঠো।”

লোকটা তার বাঁদুরে টুপিটা খুলে চাঁদর-ঢাকার মুখটা একটু ফাঁক করে আলোয় তুলে ধরে বলে, “আমি রে আমি। গোবিন্দ ওস্তাদ।”

লোকগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাঁ করে আছে। লোকটা বলে কী? গোবিন্দ ওস্তাদ! তার তো আজ বাদে কাল ফাঁসি হওয়ার কথা।

গোবিন্দ আবার টপ করে টুপিটা কপালে টেনে, চাঁদরে মুখ ঢেকে ফেলল।

একজন তোতলাতে তোতলাতে বলল, "গোবিন্দদা। তোমার না ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল! ভুত হয়ে আসনি তো?"

আর একজন রামনাম করতে করতে কঁপা গলায় বলে, "সব ভুলে গেলে নাকি গোবিন্দদা?"

গোবিন্দ জবাব দিচ্ছিল না। খোলা দরজা দিয়ে তাবুর ভিতরে গোল জায়গাটা দেখছিল এক মনে। এই সার্কাসে সে বহু খেলা দেখিয়েছে। আপনা থেকেই তার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল।

জোয়ান-জোয়ান লোকগুলো তার দিকে তাকিয়ে আছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। জেলে যাওয়ার আগে গোবিন্দ যখন সার্কাসে খেলা দেখাত তখনও সবাই তাকে ভয় খেত। মাথায় গোবিন্দ লম্বা নয় বটে, তবে তার গায়ে প্রচণ্ড জোরের কথা সবাই জানে। তার ওপর গোবিন্দর হাত-পা চলত বিদ্যুৎ গতিতে। তেমনি ছিল তার প্রচণ্ড রাগ। অমন খুনে রাগও দেখা যায় না। বড়-একটা। গোবিন্দকে তাই কেউ কখনো চটাতে সাহস করত না। আজও তাকে দেখে লোকগুলো ভয়ে ভাবনায় সিঁটিয়ে আছে।

গোবিন্দ মৃদুস্বরে একটা লোককে ডেকে আড়ালে নিয়ে বসল, "সামন্ত মশাইয়ের তবুটা কোন দিকে রে?"

"দেখা করবে গোবিন্দদা?"

"করেই যাই।"

"চলো তাহলে।" লোকটা খুশি হয়ে বলে, "সামন্তমশাই তোমার কথা খুব বলে। বলে, গোবিন্দটা খুন করল বটে, কিন্তু ওরকম খেলোয়াড় হয় না।"

গোবিন্দ একথার জবাব দিল না। বারো-তেরো বছর বয়সে সে সামন্ত মশাইয়ের সার্কাসে চলে এসেছিল। এই সার্কাসের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরেই ছোটো থেকে বড় হয়েছে। সে আর-একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সামন্তমশায়ের তাবুটা একটু পিছনের দিকে, আলাদা জায়গায়। তাঁবুর এমনিতে কোনো চাকচিক্য নেই, তবে ভিতরটা বেশ বৈঠকি ঢঙে সাজানো। সেজবাতি জ্বলছে। নিচু একটা তক্তপোষে পুরু গদির বিছানা। তার ওপর বেশ কয়েকটা পুরুষ্টু তাকিয়া। বুড়ো সামন্তমশাই বসে ভাল গন্ধওলা তামাক খাচ্ছে গড়গড়ায়। সামার চেহারা রোগার দিকেই, তবে রুগণ নয়। মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। মত পাকানো গোঁফ। চোখের দিকে চাইলে বুক গুড়গুড় করে। ভয়ডর বলতে কিছু নেই সেই চোখে। তবে লোকে তাকে ভয় খায়, আবার ভালও বাসে। চিরকুমার সামন্তমশাই সারা জীবন তিলে তিলে এই সার্কাসখানা তৈরি করেছে। সার্কাসটাই তার ধ্যান-জ্ঞান। এটা থেকে তার বেশ মোটা লাভও হয়। কিন্তু সেই টাকা কে খাবে তার ঠিক নেই। সামন্ত তাই ইদানীং একটু চিন্তিত।

দুজনে ঘরে ঢুকতেই সামন্ত মুখ থেকে তামাকের নলটা সরিয়ে অল্প আলোয় ঠাহর করে দেখতে-দেখতে বলে, "কে রে? কী চায়?"

গোবিন্দ এগিয়ে গিয়ে ভঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াল। মুখের ঢাকা সরিয়ে বলে "আমি গোবিন্দ, সামন্তমশাই।"

সামন্ত যেন ছ্যাকা খেয়ে সোজা হয়ে বসে। বলে "কে বললি?"

"গোবিন্দ। মনে পড়ছে না?"

"গোবিন্দ।" বলে সামন্ত হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে "তোর না ফাঁসি হয়ে গেছে?"

"হলে আর আসতাম কী করে? "আয় তে, এগিয়ে আয়, আলোতে ভাল করে দেখি।"

গোবিন্দ হাসিমুখে এগিয়ে গেল। দাড়িগোঁফওয়ালা মুখে সেজবাতির আলো পড়ল।

******

রামু ট্রাপিজের খেলা দেখে তাজ্জব। কী সাহস। অন্য সব সার্কাসের মতো এরা নীচে কোনো জালও খাটায়নি। পড়ে গেলে মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। হাত-পা ভেঙে "দ" হয়ে যাওয়ার কথা।

"উঃ, কী খেলা গবাদা। আমি ট্রাপিজ শিখব।"

গবা হেসে বলে, "আরো আছে। দেখই না"

ট্রাপিজ শেষ হতেনা-হতেই সাহেবি পোশাক পরা সার্কাসের ম্যানেজার এসে ঘোষণা করল, "আজ আপনাদের আমরা একটা নতুন। খেলা দেখাব। লখিন্দর আর কালনাগিনীর খেলা। জীবন ও মৃত্যুর খেলা। এই খেলায় একদিকে থাকবে আমাদের নতুন এক ওস্তাদ মাস্টার লখিন্দর অন্যদিকে থাকবে একটি বিষাক্ত রাজ-গোখরো। সাপটার বিষদাঁত আমরা কামাইনি। যে-কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। সদ্য জঙ্গল থেকে ধরা বুনো সাপ। এ খেলা সবার শেষে।"

রামু রোমাঞ্চিত হল। আজ নতুন খেলা বাঃ, কপালটা ভাল।

এরপর সাইকেল, দড়ি, বাঘ, সিংহ, চোখ বেঁধে ছোরা নিক্ষেপ-একের পর এক হয়ে যেতে লাগল। রামুর আর পলক পড়ে না। বাঘ-সিংহের খেলা দেখে গায়ে রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল তার। লম্বা আর বেটে জোকার দুটোও খুব হাসাল।

সবার শেষে নতুন খেলা।

সব আলো জ্বেলে গোল এরেনাটাকে একেবারে ফাঁকা করে দেওয়া হল। বাজনা বাজতে লাগল অত্যন্ত মৃদু শব্দে। একটা সুরেলা বাঁশির সুর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কয়েকজন তোক একটা মস্ত খাঁচা টেনে আনল মাঝখানে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল, খাঁচার মধ্যে একটা বিশাল ভয়ঙ্কর সাপ বিড়ে পাকিয়ে আছে।

খাঁচার মাথায় একটা লোক বসে আছে।

ম্যানেজার একটা পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "এবার আসছেন মাস্টার লখিন্দর। কিন্তু আগেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, মাস্টার লখিন্দরের মুখ আপনারা দেখতে পাবেন না। কয়েক বছর আগে এক দুর্ঘটনায় ওর মুখটি পুড়ে বীভৎস হয়ে যায়। তার ফলে উনি সব সময়েই মুখোশ পরে প্রকাশ্যে আসেন।"

ঘোষণা শেষ হল। বাজনা মৃদু তরঙ্গে বাজতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোকটা ছাড়া বাকি সবাই সরে গেল এরেনা থেকে।

আগাগোড়া কালো পোশাক এবং কালো মুখোশ পরা মাস্টার লখিন্দর এসে ঢুকল। ভারী চটপটে তার হাঁটার ভঙ্গি। চওড়া কাধ, সরু কোমর, আঁট পোশাকের ভিতর দিয়ে শরীরের শক্ত বাঁধুনি দেখা যাচ্ছে।

খাঁচার ওপরের লোকটা দরজাটা ওপর দিকে টেনে তুলতে না-ভুলতে বিশাল সাপটা বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে এল বাইরে। লখিন্দর তখনো দর্শকদের অভিবাদন শেষ করেনি। ঠিক এই অপ্রস্তুত মূহুর্তে বিশাল গোখরো লখিন্দরের পিঠ সমান উঁচু ফণা তুলে সাঁই করে চাবুকের মতো ছোবল দিল।

সেই দৃশ্য দেখে আর সকলের মত চোখ বুজে ফেলল রামু। একটা মৃদু "গেল গেল এই রে, সব শেষ" গোছের আওয়াজও বেজে গেল চারদিকে।

০৬-১০. কুন্দকুসুম চোখ বোজেননি

সবাই চোখ বুজলেও কুন্দকুসুম চোখ বোজেননি। বরং তার চোখের পলক পড়ছিল না তাঁবুর চারদিকে যে "হায় হায়" ধ্বনি ভেসে গেল, তিনি তাতেও যোগ দিলেন না।

বিশাল রাজগোখরো যখন ছোবল দিল, তখন তার দিকে মাস্টার লখিন্দর পেছন ফিরে আছে। আর যে চাবুকের মতো গতিতে ছোবলটা এল, তা থেকে নিজেকে বাঁচানো খুব শক্ত কাজ।

কিন্তু তবু দেখা গেল, সাপটা যেখানে ছোবলটা চালাল সেখানে লখিন্দর নেই। লখিন্দর লাট্রর মতো একটা পাক খেয়ে কী করে যে সরে গেল এরেনার অন্য ধারে, সেটাই চোখ চেয়ে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন কুন্দকুসুম।

ছোবল ফসকে যাওয়ায় সাপটাও বুজি হতভম্ব। আবার বিশাল ফণা তুলে কুটিল চোখে সাপটা দেখে লখিন্দরকে। কিন্তু ওস্তাদ লখিন্দর তখনো সাপটার দিকে পিছন ফিরে দর্শকদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। যেন সে জানেই

যে তার পিছনে কালান্তক যমের মতো গোখরো।

আবার এরেনার ওপর বিদ্যুৎ খেলিয়ে সাপটা এগিয়ে গেল এবং শপাং করে ছোবল বসাল! এবার বাঁ পায়ের ডিমে।

সেই দৃশ্য দেখে দর্শকরা পাগলের মতো চেঁচাতে থাকে, "মরে গেল মরে গেল!"

লখিন্দর এবার সরেওনি ভাল করে। শুধু বাঁ পাটা একটু ছড়িয়ে দিয়েছিল

এক চুলের জন্য ছোবলটা পায়ে না-লেগে মাটি ছুঁয়ে উঠে গেল আবার।

"বন্ধ করো! এ সর্বনেশে খেলা বন্ধ করো!" বলে মহিলারা চেঁচাতে লাগলেন। চেঁচানোই স্বাভাবিক। লখিন্দর যে সাপটার দিকে তাকাচ্ছেই না।

সাপটা যখন তৃতীয় বার ছোবল তুলেছে, তখন লখিন্দর উবু হয়ে তার ডান পায়ের জুতোর ঢিলে-হয়ে যাওয়া ফিতে বাঁধছে মুখ নিচু করে। সুতরাং তার মাথাটা এবার একেবারে সাপের দোল-দোলন্ত ফণার সামনে।

"আর রক্ষে নেই গবাদা!" বলে রামু হাঁটু খিমচে ধরে।

এবার কুলকুসুমেরও চোখ বন্ধ করে ফেলতে ইচ্ছে হল। চোখের সামনে একটা নির্ঘাত মৃত্যু কার দেখতে ভাল লাগে!

সাপটা ফোঁস করে একটা ক্রুদ্ধ আওয়াজ ছেড়ে সটান লখিন্দরের মাথা লক্ষ করে হাতুড়ির মতো নেমে এল।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বসা অবস্থাতেই লখিন্দর একটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে সরে গেল পিছনে। একবারও সাপটার দিকে না তাকিয়ে বসে বসে সে জুতোর ফিতেটা শক্ত করে বেঁধে নিল ভারী নিশ্চিন্তভাবে।

পুলিশের একজন ইনফরমার বৈরাগীর ছদ্মবেশে কুকুসুমের পিছনের বেঞ্চে বসে ছিল। কুন্দকুসুম একবার তার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে মাথাটা একটু ওপরে তুললেন। অর্থাৎ লোকটা কে?

ইনফরমার চারদিকে চেয়ে দেখে নিল, কেউ তাকে লক্ষ করছে কিনা। কিন্তু এরেনায় যে খেলা চলছে, তার দিকে রুদ্ধশ্বাস চেয়ে মানুষ কেউ কারো দিকে তাকাতে ভুলেই গেছে। ইনফরমার মুখটা এগিয়ে এনে মৃদু স্বরে বলল, "জানি না। তবে এ ধরনের খেলা একসময় দেখাত গোবিন্দ ওস্তাদ। কিন্তু কাশিমের চরের সেই মার্ডার কেসে গতকাল তার ফাঁসি হয়ে গেছে।

“হয়ে গেছে?”

“হয়ে গেছে। গোবিন্দর ভাই জেলখানার গিয়ে মড়া নিয়ে শ্মশানে দাহ পর্যন্ত করেছে বলে খবর পেয়েছি।”

“মুখোশের আড়ালে লোকটা তাহলে কে একটু খবর নিও।”

“যে আজ্ঞে।”

ওদিকে এরেনায় মুখোশাবৃত লখিন্দর বারবার অবহেলায়, আনমনে ছোবল এড়িয়ে এড়িয়ে সাপটাকে হয়রান করে তুলল। অবশেষে সেই রাজগোখরো যখন ক্লান্তিতে ছোবল মারা মুলতুবি রেখে একধারে বিড়ে পাকিয়ে বিশ্রাম নিতে বসল তখন শেষ হল খেলা। জীবন ও মৃত্যুর এই বিপজ্জনক খেলা দেখে দর্শকরা এত জোর হাততালি দিল যা অন্য কোন খেলায় দেয়নি।

লখিন্দর একবার হাত তুলে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এরেনা থেকে।

রাত গভীর। সার্কাসের চত্বরে যে যার তাঁবুতে ঘুমোচ্ছ। জেগে আছে শুধু কয়েকজন চৌকিদার। আর জেগে আছে বুড়ো সামন্তর তাবুতে সামন্ত আর গোবিন্দ ওস্তাদ।

সামন্ত মৃদু স্বরে বলে, “এবার ঘটনাটা খুল বল।”

গোবিন্দ একটু হাসল। বলল, “কাল আমার ফাঁসি হয়ে গেছে। এমন কী, দাহকাজ পর্যন্ত সারা।”

সামন্ত তামাকের নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বলে, “আর একটু খোলশা করে বল। তোকে ফাঁসি দেয়নি তো দিল কাকে?”

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তা আমি জানি না। ফাঁসি হবে বলে জানিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আমিও তার জন্য তৈরি ছিলাম। কিন্তু মাসখানেক আগে একদিন সকালে আমাকে যখন জেলখানার চত্বরে পায়চারি করাচ্ছিল, তখন দেখি কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ভারা বেঁধে জেলখানার উঁচু ঘেরা দেয়ালে মেরামতির কাজ করছে।"

"তুই তখন কী করলি?"

"আজ্ঞে মাথায় তখন মতলবটা খেলে গেল। ভাবলাম, এই সুযোগ পরে আর পাব না। আমাকে দুজন বিশাল চেহারার সেপাই পাহারা দিচ্ছিল। আমি তাদের ঠাট্টা করে বললাম ঐ যে রাজমিস্ত্রি ভারা বেঁধেছে ওটায় উঠে যদি কোনো কয়েদি পালায় তবে কী করবে? ওরা বলল, অত সহজ নয়। তুই পারবি? আমি হেসে বললাম, চেষ্টা করতে পারি। ওরাও হাসল, বলল, কর না দেখি।"

"বলল? "

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিও ইয়ার্কির ভাব দেখিয়ে হেঁটে গিয়ে ভারার পয়লা বাঁশটায় উঠে পড়লাম। তারা দেখি তখনো মোচে তা দিচ্ছে আর ফিড়িক ফিড়িক করে হাসছে। আমি আর এক ধাপ উঠলাম। কেউ কিছু বলল না। রাজমিস্ত্রিরাও একমনে কাজ করে যাচ্ছে, আমার দিকে তাকাচ্ছে না। এক ধাপ দু ধাপ করে আমি একদম দেওয়ালের মাথায় পৌঁছে দেখি, তখনো সেপাই দুটো হাসছে আর মোচে তা দিচ্ছে।"

"বলিস কী?"

"যা হয়েছিল তাই বলছি। দেয়ালের মাথায় উঠে আমার মনে হল, কেননা কারণে জেলখানার কর্তৃপক্ষ আমাকে পালানোর সুযোগ ইচ্ছে করেই দিচ্ছে। নইলে ততক্ষণে পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠার কথা। বাজল না দেখে আমি দেয়ালের ওপর থেকে ঠাকুরের নাম করে বাইরের দিকে ঝাঁপ মারলাম। ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে অনেক উঁচু থেকে

লাফ মারার অভ্যাস থাকায় হাড়গোড় ভাঙেনি। পড়েই কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে সামলে নিলাম। তারপর দৌড়।”

“তাহলে ফাঁসিটা হল কার?”

“তা আর খোঁজ নিইনি। পালিয়ে সোজা গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। একটা ব্যাগে জামাকাপড় আর কিছু টাকা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুনি। বাড়ির লোককে বলে এলাম, যেন কাউকে কিছু না বলে। নিজের বাড়ি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর একটা মাত্র আশ্রয় আছে, তা হল এই সার্কাস। সার্কাসের জন্য জেলখানাতেও প্রাণটা কাদত। তাই ঘুরতে-ঘুরতে এসে হাজির হয়ে পড়েছি।”

“বেশ করেছিস। ভাল করেছিস। তবে কিনা...” সামন্তকে একটু চিন্তিত দেখায়।

“আমি এসে কি আপনাকে বিপদে ফেলাম সামন্তমশাই?”

সামন্ত গম্ভীর হয়ে বলে, “তুই আমার ছেলের মতো। ছেলে যদি বিপদে পড়ে আসে, তাহলে কি নিজের বিপদের চিন্তা থাকে রে গাধা! আমি ভাবছি তুই আজ খেলা দেখিয়ে ভুল করলি কি না। কুন্দ দারোগা আজ খেলা দেখতে এসেছিল। লোকটা খুবই বুদ্ধিমান। যে যদি গন্ধ পায় তবে তোর পক্ষে এ-জায়গা আর নিরাপদ নয়।”

“খেলা না দেখিয়ে যে হাঁফিয়ে পড়েছিলাম সামন্তমশাই। জেলখানায় তো ধরেই নিয়েছিলাম এই জীবনে আর সার্কাসের খেলা দেখানো হবে না। ঠাকুরের কাছে রোজ বলতাম, পরের জন্মে যেন আবার সার্কাসের খোলোয়াড় হতে পারি।”

সামন্ত মাথা নেড়ে, “এই সার্কাসকে তুই যে বুক দিয়ে ভালবাসিস তা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে? আমারও ইচ্ছে ছিল, মরার সময় এই সার্কাসের সব ভার তোকেই দিয়ে যাব। কিন্তু কাশিমের চরের সেই খুনটাই সব গোলমাল করে দিল।”

এবার গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, "হরিহর পাড়ুই লোক খুব ভাল ছিল। কিন্তু তাকে যে আমি খুন করিনি, তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?"

"করি। আমি জানি, তুই রাগী বটে, কিন্তু কখনো পিঁপড়েটাকেও মারতে চাস না। খুন তোরা দ্বারা হওয়ার নয়!"

* * * * * *

রাত নিশুত হলেও যে সবাই লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ে তা নয়।

উদ্ধববাবুর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা ছোট্ট খুপরিতে খাঁটিয়ায় বিছানো খড়ের বিছানায় কুটকুটে এক কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামসে ঘুমোচ্ছিল গবা পাগলা। কিন্তু ঘুম তার খুব সজাগ। হঠাৎ চটকা ভেঙে সে উঠে বসল।

দুর্দান্ত হাড় কাঁপানো শীত পড়েছে আজকে। বাইরেটা কুয়াশা আর অন্ধকারে মাখা। খুপরিটার দরজা একটা কাঠের খিল দিয়ে আটকানো ছিল। সেটা খুলে

দরজা অনেকখানি ফাঁক হয়ে আছে, এটা অন্ধকারেও দেখতে পেল গবা। দেখে মৃদু একটু হাসল। তারপর বেশ হেঁকে বলে উঠল, "কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি খেকশিয়ালি পালায় ছুটি। পালা পালা পালা রে বাপ, নইলে হয়ে যাবি যে সাফ। পাগলা গবা ধরবে এসে টুটি!"

হয়তো আরো বলত গবা, কিন্তু তার আগেই দরজা নিঃশব্দে আর-একটু ফাঁক হল। একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল চৌকাঠে।

"গবা," একটা ভারী গলার গম্ভীর আওয়াজ হল।

"ও।" গবা জবাব দেয়।

"তুই আসলে কে আমি জানি।"

গবা চোখ পিটপিট করতে থাকে।

লোকটা আবার বলে, "যদি বেঁচে থাকতে চাও তবে আমি যা বলছি ঠিক তাই করবে। পাগলামির ভান কোরো না। আমি জানি, তুমি কস্মিনকালেও পাগল নও।"

গবা নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করে, "আপনি কে?"

.

০৭.

উদ্ধববাবু ওঠেন একেবারে কাক-ভোরে। তখনও আকাশে চাঁদ তারা থাকে। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ঠাকুর-পূজো সেরে বেড়াতে বেরোন। আর বেরিয়েই বেশ গলা ছেড়ে গান ধরেন।

আসল কথা হল, ছেলেবেলা থেকেই উদ্ধববাবুর খুব গাইয়ে হওয়ার শখ। শখটা খুব তীব্র, কিন্তু তাঁর গলায় সুর নেই। সুরটা এমন জিনিস যে, জন্ম থেকে যার আছে তার আছে, যার নেই, সে গলা সেধে মুখে রক্ত তুলে ফেললেও হবে না।

উদ্ধববাবুর গলা নেই। তবু সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গলা সেধেছেন, গানের মাস্টারমশাই রেখেছেন, বড় বড় ওস্তাদের জলসায় গেছেন। তার ধারণা ছিল সাধনায় সব হয়। কিন্তু গানের সাধনা করতে গিয়ে লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি হচ্ছে দেখে বাবা খুব রাগারাগি করতেন। তারপর গান গাইতে বসলে পাড়া প্রতিবেশীরা কাসর-ঘন্টা বাজাত, শখে ফুঁ দিত। একবার নতুন এক বউদি তাকে বলেছিলেন, "উদ্ধব ঠাকুরপো, চার আনা পয়সা দেব, আজ আর গান গেও না।"

এইসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর উদ্ধববাবু আর প্রকাশ্যে গান গায় না। তবে তাঁর এখনো ধারণা, চেষ্টা করলে এবং লোকে বাগড়া না দিলে তার গলা একদিন খুলে যেত ঠিকই।

যেত কেন, গেছেই। প্রকাশ্যে গান না গাইলেও রোজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে শহরের নির্জন প্রান্তে এসে উদ্ধববাবু নিয়মিত গলা সাধেন। দীর্ঘদিনের এই গোপন সাধনার ফলে তিনি ইদানীং লক্ষ করছেন, তার গলায় সাতটা

সুর চমৎকার করছে। হাঁ করলেই যেন গলা থেকে লোকজন ডেকে সাতটা পাখি বেরিয়ে চারদিকে উড়ে বেড়ায়।

উদ্ধববাবুর খুব ইচ্ছে, এবার একদিন লোকজন ডেকে সকলের সামনে গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দেন। কিন্তু মুশকিল হল, ওস্তাদ রাঘব ঘোষকে নিয়ে। উদ্ধববাবু রাঘবকে দুচোখে দেখতে পারেন না। সারা তল্লাটের লোক রাঘবকে বড় ওস্তাদ বলে কেন যে অত খাতির করে, তাও তার বোধের অগম্য।

সে যাই হোক, একদিন তিনি পুবের মাঠে এক শিশির ভোরে খুব আবেগ দিয়ে ভৈরবী ধরেছিলেন। চোখ বুজে গাইছেন। হঠাৎ একটা ফেঁপানির শব্দে গান থামিয়ে চোখ মেলে দেখেন, সামনেই রাঘব। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে রাঘব বললেন, “এমন অনৈসর্গিক গান কখনো শুনিনি উকিলবাবু। তবে বলি এ গান সকলকে শোনানোর নয়। বিশেষ করে আপনার মক্কেলরা যদি শোনে, তবে তাদের ধারণা হবে, ইনি যখন এত ভাল গায়ক, তখন নিশ্চয়ই ভাল উকিল নন। কারণ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে একজন মানুষ সাধারণত একটা বিষয়েই পারফেকশন লাভ করতে পারে।”

সেই থেকে উদ্ধববাবুর রাগ। ইচ্ছে করেই তিনি রোজ সকালে একবার রাঘব ঘোষের বাড়ির কাছাকাছি এসে খানিকক্ষণ গান করেন। অভদ্র লোকটা বুঝুক গান কাকে বলে। আজও উদ্ধববাবু পুবের মাঠে এসে রাঘবের বাড়ির দিকে মুখ করে চমৎকার তান

লাগালেন ভৈরবীতে। গাইতে গাইতে তার নিজের পিঠ নিজেরই চাপড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, শাশ।

আশ্চর্য, এই চোখ বুজে গাইতে গাইতেই হঠাৎ টের পেলেন, কে যেন সত্যিই তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল, শাববাশ।

উদ্ধববাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন গবা পাগলা!

গবাও বেকুবের মতো চেয়ে-চেয়ে খানিকক্ষণ তাকে দেখে বলে উঠল, উদ্ধবকর্তার যে আবার গান-বাজনাও আসে, তা তো জানতাম না।”

উদ্ধববাবু একটু রাগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে কী করছিস?”

গবা মাথা চুলকে বলল, “আজ্ঞে কিছু করছিলাম না। কাল রাতে একটি লোক আমাকে এখানে খুন করে রেখে গেল। সেই থেকে মরে পড়ে ছিলাম। হঠাৎ এই সকালবেলায় আপনার গানে প্রাণ ফিরে এল। ওঃ, কী গান। মড়া পর্যন্ত উঠে বসে।”

“কী যা-তা বলছিস। কে তোকে মেরে রেখে গেল?”

“আজ্ঞে, তাকে তো চিনি না। কালো পোশাক পরা, মুখ ঢাকা। রাতে গিয়ে আমার ঘরে হাজির। বলল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, অনেক টাকা দেব। রাজি না হলে প্রাণ যাবে।”

“বলিস কী?”

“আজ্ঞে, যা ঘটেছিল, বলছি, লোকটা বেশি ধানাই-পানাই না করে বলল, উদ্ধববাবু যে কাকাতুয়াটা কিনেছেন সেটা আসলে আমর, কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। আমি পাখিটাকে কিনতে চাই, কিন্তু উদ্ধববাবু বেচতে তেমন গা করছেন না। আইন দেখাচ্ছেন।

আমার বড় আদরের কাকাতুয়া। তা তুমি যদি পাখিটা উদ্ধার করে দিতে পারো, তবে দুশো টাকা পাবে। নইলে...”

নইলে মেরে ফেলবে?”

“ওই নইলে কথাটায় আমার খটকা লাগল। পাখিটা ফেরত চায় কেন? অত গরজ কিসের? তা আমি সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতেই লোকটা অ্যাই বড় একটা ভোজালি বের করে আর এক হাতে আমার টুটি ধরে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে নিয়ে এল। ”

“অ্যাটেমপট অব মার্ডার।” উদ্ধববাবুর ওকালতি-মাথা কাজ করছে। বিড় বিড় করে বললেন, “অ্যাটেমপট অব থেপট, থ্রেটেনিং অ্যাণ্ড অ্যাসাল্ট। তা লোকটা হঠাৎ ভোজালি বের করলই বা কেন? তুই কে কী বলেছিলি?”

“আজ্ঞে আমি তাকে বলেছিলাম, যুধিষ্ঠিরবাবু, আপনার পাখিটার জন্য এত গরজ কিসের?”

“যুধিষ্ঠিরবাবু! সে আবার কে?”

“আপনি চেনেন তাঁকে! বাচ্চাদের বাড়িতে পড়ান যে নতুন মাস্টারমশাই, তিনি।”

“বলিস কী! লোকটা কি সত্যিই যুধিষ্ঠির?”

“আজ্ঞে না। সত্যিকারের যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্তুর। ইনি তিনি নন।”

“আরে দূর গাধা! আমি বলছি আমাদের যুধিষ্ঠির কিনা।”

“তাই বা বলি কী করে? তবে যুধিষ্ঠিরবাবু খুব পান আর জর্দা খান। আমিও রাত্রিবেলায় যমদূতটার মুখ থেকে সেই জর্দার গন্ধ পেয়েছেলাম। তাই”

“তারপর?”

"তারপর মাঠের মধ্যে এলে লোকটা ছোরা রেখে দু'হাতে আমার গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলল।"

"ফেলল? তবে বেঁচে রইলি কী করে?"

"কে বলল বেঁচে ছিলাম? সেই কখন থেকে মরে পড়ে আছি। সকালবেলা আপনার গান শুনে মরা দেহও জেগে উঠল। তাই ভাবলাম এমন যার গান, তাকে একটা শাবাশ জানিয়ে আসি। তা এসে দেখি আপনি স্বয়ং।"

উদ্ধববাবু গানের কথায় একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, "গানের কথাটা অত বলার দরকার নেই।"

গবা অবাক হয়ে বলে, "বলেন কী? এমন উপকারী গান আমি জন্মে শুনিনি! আপনার গান শুনতে তেমন ভাল নয় বটে। মাথা ঘোরে, গা বমি বমি করে, ভিতরটা কেমন চমকে-চমকে ওঠে। কিন্তু মরা শরীরে প্রাণ ফিরে

আসে। পারবে রাঘব ঘোষ এমন গান গাইতে? রাঘবের তা-না-না কেবল লোক ভোলানোর জন্য। এখনো সা লাগাতে পারল না ঠিকমতো।"

একথায় উদ্ধব খুশি হলেন। বললেন "হুঁ।"

গবা বলল, "এ গান অবহেলার বস্তু নয় কবরখানার কাছে বসে গাইলে কবর খুঁড়ে অনেক মড়া জ্যান্ত হয়ে উঠে আসবে। শ্মশানের কাছে বসে গাইলে অনেক মড়া চিতা থেকে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়াদৌড়ি শুরু করবে।"

"আঃ! বাজে বকিস না তো! আমি ভাবছি কাকাতুয়াটার কথা। ওটাকে নিয়ে চারদিকে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। খোঁজ নিয়ে বের কর যে কাকাতুয়াটা আসলে কার! পাখীটা মাঝে মাঝে টাকার কথা বলে। মনে হয় কোনো গুপ্ত টাকার খোঁজ জানে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলে না।"

"আমারও তাই মনে হয়। দেখব'খন খোঁজ নিয়ে।"

শেষরাতে যখন গোটা সার্কাসের চত্বরটা ঘুমে অচেতন, তখন হঠাৎ নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি বাঘের খাঁচার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার চেহারা বিশাল দশাসই। কিন্তু হাঁটাচলা বেড়ালের মতো ক্ষিপ্র এবং নিঃশব্দ।

ছায়ামূর্তি সবচেয়ে কাছের ছোট্ট একটা তাবুর দরজার পর্দা তুলে ঢুকে যায়। তার হাতে খোলা রিভলভার এবং টর্চ। টর্চটা জ্বেলে সে ঘুমন্ত লোক দুটোকে দেখে। এরা নয়।

আবার ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ গতিতে বেরিয়ে আসে ছায়ামূর্তি, আর একটা তাবুতে ঢোকে। এখানে চারজন লোক ঘুমিয়ে আছে। টর্চ জ্বেলে ছায়ামূর্তি তাদের ভাল করে দেখে নেয়। না, এরাও নয়।

ছায়ামূর্তি একের পর এক তাঁবুতে হানা দেয়। কিন্তু যে লোকটাকে দেখবে বলে আশা করছে তাকে কোথাও দেখতে পায় না।

শেষ তাবুটা একটু দূরে। খুব ছোট্ট। চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া। এমন কী ফটকটায় তালা লাগানো।

ছায়ামূর্তি একটু দাঁড়ায়। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে টপ করে। কাটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে যায়।

রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে লোকটা খুব সতর্কতার সঙ্গে চারদিক দেখে নেয়। তারপর খুব সাবধানে পর্দাটা ফাঁক করে টর্চ জ্বালে। অস্ফুটস্বরে বলে, "আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য!"

আশ্চর্য হওয়ারই কথা। তবুটার মধ্যে কিছুই নেই। এমনকী, অন্যান্য তাঁবুর মতো একটা খাঁটিয়াও না, মানুষ তো দূরের কথা।

ছায়ামূর্তি টর্চটা জ্বেলে চারদিকে ঘুরে ঘুরে খুব ভাল করে দেখে না, এই তাবুটা এখানে কেউ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এই ফাঁকা তাবুটার জন্য এত সতর্কতা কেন তা ছায়ামূর্তি চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাইরে একটা ঢিল পড়ার শব্দ হল না? বেশ বড় একটা ঢিল।

ছায়ামূর্তি খুব সতর্কতার সঙ্গে দরজার কাছে আসে এবং বাইরে উঁকি মারে। চারদিকে আজ বেশ কুয়াশা আছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। শেষরাতের একটু জ্যোৎস্নায় চারদিক খুব আবছা দেখা যায়।

ছায়ামূর্তি বেরিয়ে আসার জন্য বাইরে পা দিতেই ঘটনাটা ঘটল।

পিছন থেকে হঠাৎ কে যেন বজ্রকঠোর হাতে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা। তারপর হাঁটু দিয়ে কোমর ঠেসে ধরল। ছায়ামূর্তি নিজে প্রচণ্ড শক্তিশালী লোক। গায়ের জোরে তার জুড়ি নেই। সুতরাং সে এক ঝটকায় হাতের বাঁধনটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। যে তাকে ধরেছে সে শুধু তার চেয়ে বেশী শক্তিশালীই নয় অনেক বেশী ক্ষিপ্রও। এক হাতে ছায়ামূর্তির গলাটা ধরে রেখেই অন্য হাতে রিভলভার-ধরা হাতর ওপর একটা কারাটে চড় বসাল।

রিভলভারটা ছিটকে গেল হাত থেকে। ছায়ামূর্তি যন্ত্রণায় ও বলে আবার লোকটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু জোঁকের চেয়েও ছিনে লোকটার হাত আরো বজ্রবাঁধনে চেপে ধরল তাকে। ছায়ামূর্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

.

০৮.

সামন্ত মশাইয়ের তাঁবুতে কুন্দকুসুম চোখ মেলে চাইলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞানবয়সে এর আগে আর কখনো কোনো অবস্থাতেই তিনি জ্ঞান হারাননি। অজ্ঞান হওয়ার অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। কারো সঙ্গে গায়ের জোরে হেরে ‘ওয়াও এই প্রথম।

প্রবল শীতের মধ্যে একটা লোক তার মুখে অনবরত জলের ঝাঁপটা দিচ্ছিল। কুন্দকুসুম জলদগম্ভীর স্বরে তাকে বললেন “আর না।”

তারপর উঠে বসলেন। লোকটা বিনীতভাবে একটা গামছা এগিয়ে দিল। তিনি মুখ মুছতে-মুছতে দেখলেন, সামনেই একটা ফোল্ডিং চেয়ারে সামমেশাই উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে। চোখে চোখ পড়তেই বলে, “এখন একটু ভাল বোধ করছেন তো?”

কুন্দকুসুম নিজের গলায় হাত বোলালেন। ব্যথা। কোমরেও যেন কুমির কামড়ে ধরে আছে। কব্জিটাও বেশ কাবু। ঝিনঝিন করছে। কিন্তু সেই বলবান লোকটার রাক্ষুসে আলিঙ্গনে তার এতক্ষণে মরে লাশ হয়ে যাওয়ারই কথা। বেঁচে যে আছেন সেই ঢের। জলদগম্ভীর গলাতে বললেন, “বেশ ভাল বোধ করছি। এ-যাত্রায় মরছি না। মরলে আপনার পো হারকিউলিসটির ফাঁসি হত।”

সামন্তমশাই শশব্যতে বলে, “আগে একটু গরম দুধ খান। গায়ে বল হোক, তারপর সব কথা।”

তার ইশারায় মূহুর্তের মধ্যে একটা আধসেরি গ্লাস ভর্তি ঈষদুষ্ণ দুধ এসে গেল।

কুন্দকুসুম দুধটায় চুমুক দিয়ে বলেন, “বাঃ বেশ দুধ। তা এ নিশ্চয়ই গরুমোষের দুধ নয়।”

“কেন বলুন তো!”

“আপনার হারকিউলিসটির গায়ে যা জোর, তাতে মনে হয় সে হাতির। দুধ খায়। কিংবা বাঘের। আপনার সার্কাসে বাঘ আর হাতির তো অভাব নেই।”

সামন্ত বিনীতভাবে হাসে। তবে তার চাউনিতে উদ্বেগটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কুকুসুমের এই দুধটুকুর দরকার ছিল। চোঁ করে গ্লাস নামিয়ে রেখে বললেন, "বিনা নোটিসে কাল রাতে আপনাদের তাবুতে হানা দেওয়া আমার উচিত হয়নি এটা মানছি। আমার সার্চ ওয়ারেন্টও ছিল না।"

সামন্তমশাই গলা খাঁকারি দিয়ে বলে "আজ্ঞে একাট নোটিস দিয়ে এলে এই বিপদে পড়তেন না। অন্ধকারে আপনাকে চিনতে না পেরে চোর-ছ্যাচড় ভেবে আমাদের ওয়েটলিটার ছেলেটা ওই কাণ্ড করে ফেলেছে।"

কুন্দকুসুম একটা শ্বাস ফেলে বললেন ওর দোষ নেই। আমার আচরণটা চোরের মতোই হয়েছিল। আপনার পাহারাদাররা আমাকে ধরতে পারেনি, কিন্তু এই ছোঁকরা-কী নাম ছোঁকরার?"

"আজ্ঞে ভবতোষ। খুব ভাল ছেলে। ধার্মিক। মাঝরাতে উঠে নামধ্যান করে। কাল রাতেও তাই করছিল।"

"হ্যাঁ ভবতোষ। তা এই ভবতোষ তো দিব্যি কারাটেও জানে। যা একখানা ঝেড়েছিল আমার কব্জিতে। ভাল কথা, পিস্তলটা আছে তো?"

সামন্ত মাথা নেড়ে বলে, "আছে। চিন্তা করবেন না।"

কুন্দকুসুম বলেন, "আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন, আমার এই আচরণের অর্থ কী! বলতে বাধা নেই, সেদিন সেই সাপের খেলা দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। কোনো মানুষের অত অ্যাজিলিটি থাকতে পারে তা জানতাম না। কিন্তু মনে হয়েছিল মাস্টার লখীন্দরের আসল নাম মাস্টার লখীন্দর নয়। মুখোশের আড়ালে লোকটি কে সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।"

সামন্তের চোখে উদ্বেগটা বাড়ল। বলল, "আজ্ঞে সে আর বেশি কথা কী? হকুম করলেই তাকে সামনে হাজির করতাম। খামোখা এত কষ্ট করতে গেলেন।

কুকুসুমের আচরণটা যে অদ্ভুত ঠেকছে লোকের চোখে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তার জন্য লজ্জা পেলেন না। লজ্জা পাবার অভ্যাস তার নেই।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "পুলিশের কাজ একটু অন্যরকম হয়। সবসময় সোজা পথে-চললে আমাদের চলে না। ঠিক আছে, লখীন্দরকে একবার ডাকুন।"

আবার সামন্তর ইঙ্গিতে একজন বেরিয়ে যায়। মিনিটখানেকের মধ্যেই বেশ ছমছমে চেহারার এক ছোঁকরা তাবুতে ঢুকে কুন্দকুসুমকে নমস্কার করে দাঁড়ায়।

কুন্দকুসুম চোখ দিয়ে লোকটাকে মেপে নিচ্ছিলেন। আরেকদিকে লোকটা অবিকল লখীন্দরের মাপসই বটে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুকুসুমের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা আসল লখীন্দরের একটু বেশি মাত্রায় ছোট ছিল। তিনি একটু বিস্ময়ের গলায় বললেন, "এই কি সেই?"

"আজ্ঞে। দলছুট হয়ে গিয়েছিল। ওর ঠাকুরমার খুব অসুখ। তাঁকে দেখতে দেশের বাড়িতে যাওয়ায় এখানে প্রথমে খেলা দেখাতে পারেনি। অদ্য ফিরেছে।"

"হুঁ।" বলে কুন্দকুসুম ছেলেটার দিকে চেয়ে বলেন, "তোমার নাম কি?"

"লখীন্দর। লখীন্দর কর্মকার।"

"আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো।"

কুন্দকুসুম যে সন্তুষ্ট হননি, তা টের পেল সামন্ত। মুখে উদ্বেগটা বাড়ল। বলল, "লুচি ভাজা হচ্ছে। একটু বসে যান দারোগাবাবু।"

"নাঃ, কাজ আছে।" বলে কুন্দকুসুম উঠলেন।

বাড়িতে ফিরে সেদিন কুলকুসুম তার দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবরকে খুব পেটালেন, পড়ার টেবিলে বসে কাটাকুটি খেলছিল বলে। আসলে সেটা কারণ নয়। খুব রেগে গেলে কুকুসুমের রাগ পড়ে একবার কাউকে ধরে বেধড়ক পেটালে।

বাসায় এসে তিনি আড়কাঠিকে ডেকে পাঠালেন। সুড়ুঙ্গে চেহারার ধুর্ত লোকটা এসে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর খবর ঠিক তো?"

"আজ্ঞে একদম পাকা।"

"সামন্ত কিন্তু অন্য এক ছোঁকরাকে দেখাল।" সামন্ত খুনিটাকে আড়াল করছে।"

"আচ্ছা যা। চোখ কান খোলা রাখিস।"

যুধিষ্ঠির রায় সকালবেলায় যথারীতি পড়াতে এসেছেন। নিপাট ভালমানুষ। সাদা ধুতি আর সাদা শার্ট পরেন। অল্পবয়সী। চোখেমুখে লেখাপড়া এবং বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে দোষের মধ্যে জর্দা দেওয়া পান খান।

উদ্ধববাবু তক্কেতক্কে ছিলেন। কাছারি-ঘরে মক্কেলদের ভিড় ছিল খুবই। তবু এক ফাঁকে এসে ছেলেদের পড়ার ঘরে হানা দিলেন। উদ্ধববাবু কোনরকম নেশা পছন্দ করেন না। তিনি নিজে সুপুরিটা পর্যন্ত খান না। বাচ্চাদের পড়ার ঘর জর্দার গন্ধে ম-ম করছে। তিনি একটু নাক কোচকালেন। গন্ধটা খারাপ নয়। বরং বেশ ভাল দামি আতরের গন্ধই। কিন্তু বাচ্চাদের শিক্ষকরা যদি নেশা-টেশা করেন, তাহলে শিশু-মস্তিষ্কে তার প্রভাব পড়তে পারে।

উদ্ধববাবু গলা খাকারি দিলেন। যুদ্ধিষ্ঠির খুব নিবিষ্ট মনে রামুকে অঙ্ক করাচ্ছিলেন। শব্দ শুনে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "কিছু বলবেন?"

উদ্ধববাবু ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষকদের সম্মান করতে শিখেছেন। তার মতে দেশের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ হলেন শিক্ষকেরা। রাষ্ট্রের উচিত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির চেয়ে শিক্ষকদের বেশি সম্মান দেওয়া। নইলে শিক্ষকের ওপর ছাত্রদের শ্রদ্ধা আসে না। আর শ্রদ্ধা ছাড়া জ্ঞান আসবে কী করে?

উদ্ধববাবু খুব বিনীতভাবে হাতজোড় করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "আজ্ঞে কথা সামান্যই। আপনার ব্যক্ত হওয়ার কিছু নেই। বসুন।"

যুধিষ্ঠির বসলেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কথাটা কীভাবে শুরু করবেন তা বুঝতে পারছিলেন না। তিনি উকিল মানুষ। পাজি-বদমাশ খুনে দেখে-দেখে চোখ পেকে গেছে। সেই অভিজ্ঞ চোখে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে কোনো খুনির লক্ষণ দেখলেন না।

উদ্ধববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "ইয়ে, আপনার পান খাওয়ার অভ্যাস আছে দেখছি।"

"আজ্ঞে। পান খেলে আমার কনসেনট্রেশনটা ভাল হয়।"

"তা ভালই। ইয়ে, বলছিলাম কী, আপনি কি রাত্রিবেলায় পান-জর্দা খান?"

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বলেন, "আজ্ঞে না! সারাদিনে এই সকালবেলাই একটা। ব্যস।"

উদ্ধব মাথা চুলকে বললেন, "গবাটা যে কী সব আবোল-তাবোল বকে তার ঠিক নেই।"

"গবা কে?"

"ওই একটা পাগল আছে। এ-বাড়িতেই থাকে।"

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, "গবা পাগলা?"ওঃ হোঃ, তার কথা সব শুনেছি। লোকে বলে লোকটা নাকি ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক। তার সঙ্গে একবার দেখা করার খুব ইচ্ছে আছে।"

উদ্ধববাবু দুম করে জিজ্ঞেস করলেন "আমাদের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া আছে তা কি আপনি জানেন?"

যুধিষ্ঠির আরো একটু অবাক হয়ে বললেন, "জানি বই কী। রামুর মুখে শুনছিলাম আপনাদের কাকাতুয়াটা নাকি গুপ্তধনের কথা বলে।"

উদ্ধববাবু একটু রাগত চোখে রামুর দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, "কাল রাতে আপনার ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

উদ্ধববাবুর ছেলেমেয়েরাও পড়া ভুলে বাবার দিকে চেয়েছিল। এবার তারা নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করতে লাগল। যুধিষ্ঠিরও খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। পান, কাকাতুয়া, ঘুম এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে তারা সবাই অবাক।

উদ্ধববাবু বুঝতে পারছেন, আদালতে দাঁড়িয়ে যত ভাল সওয়ালই করুন কেন আজ ছেলেমেয়েদের সামনে তাদের মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে সওয়াল জবাব করতে গিয়ে তিনি নিতান্ত আহাম্মক বা পাগল বলে প্রমাণ হচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির অবাক হলেও কথায় তা প্রকাশ করলেন না। বিনীত ভাবেই বললেন, "আজ্ঞে আমার বরাবরই ভাল ঘুম হয়। কাল রাতেও মড়ার মতো ঘুমিয়েছি।"

"বেশ বেশ।" বলে উদ্ধববাবু তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। গবাটাকে হাতের কাছে পেলে মাথায় কষে একটা গাট্টা লাগাতেন।

কিন্তু গবা হাতের কাছে ছিল না।

.

০৯.

সকালবেলায় সার্কাসের খেলোয়াড়রা ট্রেনারের নির্দেশে কসরত করছিল। আসল যে-সব খেলা তারা দেখায়, তার চেয়েও এই কসরত বেশি কঠিন।

কক্সরতের সময় ট্রাপিজের জন্য নীচে জাল টাঙানো হয়েছে। জালের ওপর অনেক উঁচুতে, শূন্যে ট্রাপিজ-শিল্পীরা দোল খাচ্ছে। জালের নীচে চলছে সাইকেল, বীম ব্যালানস ইত্যাদি। এক ধারে শক্ত করে দুটো খুটিতে বাঁধা তারের ওপর চলছে শীর্ষাসন, এক-চাকার সাইকেলে একজনকে কাঁধে নিয়ে আর-একজন এপার-ওপার হচ্ছে আগু-পিছু করে। জোকাররা নানারকম ডিগবাজীর ভেলকি লাগাচ্ছে এরেনার অন্য ধারে। দামি সীটের একটা চেয়ারে বিমর্ষ মুখে বসে দেখছে সামন্ত। পুলিশ পিছনে লেগেছে, এখানকার ডেরাডাণ্ডা শিগগিরই তুলতে হবে। কিন্তু তুললেই যে রেহাই মিলবে এমন নয়। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হওয়ার পর কিছুদিন পুলিসের জ্বালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। গোবিন্দকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর ঝামেলা মিটেছিল বটে, কিন্তু গোবিন্দের শোকে সামন্তর আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরেছে, সেই সঙ্গে ঝামেলাও। মেরে ফেললেও অবশ্য সার্কাসের কেউই পুলিসের কাছে স্বীকার করবে না যে, গোবিন্দ এখানে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাতে আর কতটুকু কী লাভ হবে? ভেবে-ভেবে সামন্তর মাথা গরম, মন উচাটন।

একটা উটকো লোক হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকে পড়ায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। সামন্ত চোখ তুলে দেখে, একটা পাগল। গায়ে আল-পাকার কোট, গালে দাড়ি, ময়লা পাতলুন। লম্বা-লম্বা চুলে জট পড়েছে। বেঁটে জোকার বক্রেশ্বর রে-রে করে তেড়ে গেল তার দিকে। লোকটা বক্রেশ্বরকে লক্ষই করল না। চারদিকে চেয়ে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, “ছোঃ, এইসব খেলা দেখিয়ে তোক ঠকাও নাকি তোমরা?”

বক্রেশ্বর যখন খেলা দেখায় তখন তার হাতে একটা চুষিকাঠি থাকে। সেইটেই সে লাঠির মতো ব্যবহার করে। এখনো সেইটে বাগিয়ে ধরে বলল, “দেব নাকি কয়েক ঘা?”

লোকটা বক্রেশ্বরকে ভাল করে দেখার জন্য কোটের পকেট থেকে একটা দূরবীন বের করে চোখে লাগায়। ভাল করে দেখে নিয়ে বলে, "তোমার চেয়ে ঢের বেঁটে লোক দেখেছি। অত কায়দা দেখিও না।"

বক্রেশ্বর বুক ফুলিয়ে বলে, "আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেঁটে মানুষ। নইলে আমাকে ঠাহর করতে তোমার দুরবীন লাগল কেন হে?"

লোকটা হেসে বলে,"অ্যায়সা বেঁটে মানুষও আছে, যাকে দেখতে মাইক্রোস্কোপ লাগে। যাও, যাও মেলা বোকো না।"

বক্রেশ্বর চুষিকাঠিটা তুলে মারতে গেল। কিন্তু হঠাৎ কী ভেবে থমকে গিয়ে খানিকক্ষণ লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলে, "আরে! চেনা-চেনা লাগছে যে।"

"আমাকে সবাই চেনে। আমি হচ্ছি গবা পাগলা।"

সাজা-পাগল? না হওয়া পাগল?"

"আসলে পাগল হে, আসল পাগল?"

"বেশি বোকো না, তোমার চেয়ে ঢের বেশি পাগল লোক আমি দেখেছি।"

"দেখেছ? সত্যি?"

"সেই-সব পাগলকে দেখলেও বোঝা যায়, এই হচ্ছে খাঁটি পাগল। তাকে বলতে হয় না, আমি অমুক পাগলা।"

গবা মুখ বিকৃত করে বলল, "এমন পাগলামি দেখাতে পারি যা দেখলে তোমরা পিণ্ডি চটকে যাবে। কিন্তু এখন কাজে আসা, পাগলামির সময় নেই। সামন্তমশাইকে দুটো কাজের কথা জিজ্ঞেস করে যাব। তিনি কোথায়?"

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে লোকটাকে দেখে হঠাৎ ফিক করে হেসে বলল, "বলি ও ভাই পাগলা গবা! আর কতকাল পাগলা রবা? গোল ছেড়ে কও আসলকথা। পা নেই তার পায়ে ব্যথা।"

লোকটা মুখ বেঁকিয়ে বলে, "ভূতের সর্দি সারে, রাবণ যদি রামকে মারে, ঈশ্বর যদি বক্র তবে, গবা পাগল কেন হবে?"

বক্রেশ্বর আর গবার এই তকরারে কেউ মনোযোগ দিচ্ছিল না। যে যার কাজে ব্যস্ত। বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে আবার ফিক কর হেসে বলল, "চাঁদ বদনখানা দাড়িগোঁফে বড়ই ঢাকা, তবু চেনা-চেনা ঠেকছে হে। গলার স্বরটা লুকোতে পারোনি। তা চেনা যখন দিতে চাও না, আমারই বা কী এমন দায় ঠেকেছে চিনবার। ওই হোথা সামন্তমশাই বসে আছেন। চলে যাও সিধে।"

হাত তুলে বক্রেশ্বর সামন্তকে দেখিয়ে দেয়।

গবা গিয়ে সামন্তর পাশের চেয়ারে বেশ জুত করে বসে বলে, "এবার ঠাণ্ডাটাও পড়েছে মশাই।"

সামন্ত লোকটাকে বিরিক্তির চোখে দেখে বলে, "কী চাই?"

গবা একটু অপমান বোধ করে বলে, "ভাল লোকেদের একটা দোষ কী জানেন? তারা পাগল-ছাগলকে পাত্তা দিতে চায় না। তারা ভাবে, পাগলগুলো সত্যিই পাগল। তা পাগলগুলো কি আর পাগল নয়? তারা তো পাগলই। কিন্তু ভালো লোকগুলো এমন পাগল না মশাই, কি বলব আপনাকে....হিঃ হিঃ....পাগলগুলো যদি ভাল লোক হত তাহলে দেখতে পেত, আসলে ভাল লোকগুলোই এমন পাগল যে পাগলকেই কেবল পাগল ভাবে।"

সামন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝলাম, কিন্তু কথাটা কী?"

“কথা কী একটা? কথা অনেক।”

“সংক্ষেপে বলে ফেল।”

“বলছিলাম কী, এসব কি খেলা নাকি? বিষ্ণুপুরের ওরিয়েন্ট সার্কাস কী দেখাচ্ছে জানেন?”

“কী দেখাচ্ছে?”

“ট্রাপিজ-ফাপিজ নেই স্রেফ শূন্যে কিছু লোক উড়ে বেড়াচ্ছে। আপনি তারের খেলা দেখাচ্ছেন, তারা দেখাচ্ছে বেতারের খেলা। এ-খুঁটো থেকে ও-খুঁটো কেবল একটা বাতাসের দড়ি টাঙানো, তারই ওপর দিয়ে তোক সাইকেল চালাচ্ছে, হেঁটমুণ্ড হয়ে কসরত করছে। তাছাড়া আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আপনাদের বামনবীর মাত্র আড়াই ফুট লম্বা, আর ওরা কী দিয়েছে জানেন? ওরা বিজ্ঞাপন দিয়েছে, আমাদের বামনবীর মাত্র তিন ফুট বেঁটে।”

“তাই নাকি?”

“আলবত তাই। লম্বাই যদি হবে, তবে আর বেঁটে বললেন কী কবে? বলতে হলে এরকমই বলতে হয়, আমাদের বামনবীর তিন ফুট বেঁটে বা চার ফুট বেঁটে বা পাঁচ ফুট বেঁটে বা ছয় ফুট বেঁটে বা–”

“থাক থাক। আর বলতে হবে না।”

“বুঝেছেন তো?”

“বুঝেছি।”

“কী বুঝলেন?”

“বুঝলাম তুমি খাঁটি পাগল।”

গবা মাথা নেড়ে বলে, ভাল মানুষদের তো ঐ একটাই দোষ। তারা পাগলকে ভাবে পাগল। পাগলরা যে সত্যিই পাগল তা কি পাগলরা জানে না? আর তারা যে পাগল সেইটে বোঝানোর জন্য কোনো পাগল কি পাগল ছাড়া অন্য কোনো পাগলের কাছে যায়? বলুন!”

সামন্ত জ্বালাতন হয়ে বলে, “তাও বুঝলাম। কিন্তু বাপু হে, আজ আমার মনটা ভাল নেই।”

“মন ভাল করার ওষুধ আমি জানি।”

“বটে! কী ওষুধ?”

“একদম পাগল হয়ে যান। ভাল মানুষরা যদি পাগল না হয়, তাহলে পাগলরা যে পাগল তা বুঝবে কী করে? আর একবার যদি পাগল হয়ে পাগলামির মজা টের পায়, তবে কি আর মন খারাপ থাকে?”

“ওঃ!” বলে সামন্ত নিজের মাথা চেপে ধরল।

গবা বলল, “এই কথাটাই বলতে আসা মশাই। তবে যাওয়ার আগে, দুচারটে আজে-বাজে কথাও বলে যাই। কথাটা হল, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। রাত্রে স্পাই আসবে। রামু নামে একটা ছেলে আসতে পারে খেয়াল রাখবেন।”

বলে গবা উঠে পড়ল। সামন্ত মুখ তুলে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

গবা এরেনাটা পার হওয়ার সময় তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গি করে খেলোয়াড়দের কসরত দেখে বক্রেশ্বরের দিকে চেয়ে বলে, “আড়াই ফুট লম্বা! হুঁ লম্বাই যদি হলে তবে বেঁটে বলে অত বড়াই কেন?”

বক্রেশ্বর চোখ পিটপিট করে বলে, "তুমিও যেমন পাগল আমিও তেমনি লম্বা।"

গবা আর কথা বাড়ায় না। বেরিয়ে সোজা হাঁটতে থাকে। রবিবার বলে আজ একটু বেলায় বাজার করে হরিহরবাবু আর গদাধরবাবু ফিরছিলেন। গবার সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

গদাধরবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "এই যে বৈজ্ঞানিক গবা তোমার সারানো ঘড়িটা অদ্ভুত চলছে হে। একেবারে ঘন্টায় মিনিটে সেকেণ্ডে।"

হরিহরবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "তবে উল্টোদিকে। গদাধরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দেখুন হরিহরবাবু- "

হরিহরবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "কী বলবেন তা জানি গদাধরবাবু। তবে বলে লাভ নেই, গবা বিজ্ঞানের ব-ও জানে না। ও গবা, বলো তো, কাইনেটিক এনারজি কাকে বলে!"

গবা একটা প্রকাণ্ড হাই তুলে বলে, আপনিই তো বলে দিলেন। "তার মানে?"

"কাইনেটিক এনারজিকেই কাইনেটিক এনার্জী বলে। খুব সোজা কথা।" হরিবাবু একগাল হেসে বলেন, "দেখলেন তো গদাধরবাবু, গবা কাইনেটিক এনারজি কাকে বলে জানে না।"

গদাধরবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কে বলল জানে না? এই এই তোত বলল শুনলেন না? কাইনেটিক এনারজিকেই কাইনেটিক এনারজি বলে?"

দুজনের মধ্যে আবার একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল।

কিন্তু গবার সময় নেই। সে দ্রুত পায়ে চলেছে শহরের আর এক প্রান্তে। একটা খড়ের গাদায়।

.

১০.

পাখিদের মুশকিল হল তারা পুরনো কথা বেশিদিন মনে রাখতে পারে না। মস্তিষ্কের ততখানি ক্ষমতা তাদের নেই, স্মৃতিশক্তিও নেই। কিছুদিনের মধ্যেই তারা পুরনো বুলি ভুলে নতুন বুলি শিখতে শুরু করে। আজ সকালে রামুর ঘুম ভেঙেছে পাখিটার ডাকে। কাকভোরে পাখিটা হঠাৎ বিকট স্বরে ডাকতে শুরু করে, রামু ওঠো, রামু ওঠো, রামু ওঠো। মুখ ধুয়ে নাও। পড়তে বোসা।

রামু তো অবাক। সে ধরে নিয়েছিল, পাখিটা নতুন বুলি কিছুতেই শিখবে। তাই নিশ্চিন্ত ছিল। একটা পাখি তার ওপর খবর্দারি করবে এটা কি সহ্য হয়? কিন্তু আজ সকালে এই অদ্ভুত কণ্ড দেখে সে হতবাক। পাখিটা যে শুধু ডাকছে তা নয়, বেশ রাগের গলায় ধমকাচ্ছে। যেমনটা তার বাবা উদ্ধববাবু করে থাকেন, হুবহু সেই স্বর। ডাকছেও পাশে বাবার ঘর থেকেই। পাখির দড়টা আজকাল উদ্ধববাবুর ঘরেই ঝোলানো থাকে।

শীতের ভোরে এখনো চারিদিক বেশ অন্ধকার। তার ওপর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। এই শীতে লেপের ওম থেকে বেরোবার সময় মনে হয়ে কেউ বুঝি

গা থেকে চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে।

রামু হয়তো পাখির ডাককে উপেক্ষা করে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতো। কিন্তু পাখিটার বিকট চেঁচামেচিতে উদ্ধববাবুরও ঘুম ভেঙেছে। তিনিও উঠে গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, “এই রেমো! ওঠ!”

রামু মনে মনে রাগ চেপে রেখে ওঠে এবং শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে খুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মেজে পাথুরে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নেয়। তারপর ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করার নিয়ম।

একটা খদ্দরের চাঁদর মুড়ি দিয়ে সে যখন পড়ার ঘরে এল তখন উদ্ধববাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। রামু বাবার ঘরে ঢুকে কটমট করে পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলে, "তুই ভেবেছিসটা কী শুনি?"

পাখিটা দাঁড়ের একদিকে সরে গিয়ে জড়সড়ো হয়ে বসে বলে "বিশু! আমাকে মোয়রা না বিশু! আমি বুড়ো মানুষ। মরার সময় সব মোহর তোমাকে দিয়ে যাব।"

রামু রাগে দাঁত কিড়মির করে বলে, "আমার মোহরের দরকার নেই।" তুই চেঁচানি বন্ধ করবি কি না বল।"

পাখিটা হঠাৎ ডানা ঝাঁপটে, পায়ের শিকলের শব্দ করে ঠিক উদ্ধববাবুর মতো একটু কাসে। তারপর গম্ভীর গলায় বলে "পড়তে বসো। পড়তে বোসস। সময় নষ্ট কোরো না।"

পাখিটা পুরনো বুলি সব ভুলে যায়নি এখনো। নতুন বুলিও শিখেছে। তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই পাখিটা নতুন বুলিই বলতে থাকবে ক্রমাগত। রামুর তখন ভারী বিপদ হবে। সুতরাং পাখিটাকে না ভাগানো পর্যন্ত রামুর শান্তি নেই।

কাকাতুয়া যে সব নিরীহ প্রাণী নয় তা রামু বুঝল শিকলটা খুলতে গিয়ে যেই না দাড়ে হাত দিয়েছে, অমনি পাখিটা খচ করে ঠুকরে দিল হাতে। ডান হাতের বুড়ো-আঙুলের পিছন দিকটা কেটে গেল একটু।

কাটাকুটিকে অবশ্য রামু ভয় পায় না। প্রতিদিনই তার হাত কাটছে, মাথা ফাটছে, পা মচকাচ্ছে। ওসব গা-সওয়া। সে বাইরে গিয়ে একটু দুর্বোঘাস তুলে হাতে ডলে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়।

যারা লেখাপড়ায় ভাল হয় না তারা হয়তো বা খেলাধুলো, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা বা অন্য কোনদিকে ভাল হয়। রামুর ভাইবোনরা লেখাপড়ায় সবাই। ভাল। বোনরা ভাল গায়,

বড়দা দারুণ তবলা বাজায়, ছোড়দা দুর্দান্ত স্পোর্টসমান। রামু কোনোটাতেই ভাল নয়। ক্লাসে টেনেটুনে পাস করে যায়. বার্ষিক স্পোর্টসে বড়জোর হাইজাম্প বা দৌড়ে একটা বা দুটো থার্ড প্রাইজ পায়। গান জানে, ছবি আঁকতে পারে না। কিন্তু শরীরের সেই অদ্ভুত কাতুকুতুটার জ্বালায় সে সাংঘাতিক, সাংঘাতিক সব দুষ্টুমি করে বেড়ায়। দুষ্টু ছেলেরা সাধারণত মায়ের আদর একটু বেশিই পায়। কিন্তু রামুর কপালটা সেদিক দিয়েও খারাপ। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তার আদরই বাড়িতে সবচেয়ে কম। আসল কথা হচ্ছে তার দিকে কারো তেমন নজর নেই। রামু বলে একটা ছেলে এ বাড়ীতে থাকে মাত্র। যেমন নয়নকাজল থাকে, যেমন মাঝে-মাঝে গবা পাগলা থাকে। রামুর সন্দেহ হয়, সে নিরুদ্দেশ হলে এ বাড়ির লোকে ঘটনাটা লক্ষ্য করবে কি না।

বাইরের সিঁড়িতে বসে রামু আজ সকালে এইসব ভাবছিল। তার জীবনে শান্তি নেই।

রোদ উঠল। দাদাদিদিরা পড়ার ঘরে পড়তে বসল। আর যুধিষ্ঠির মাস্টারমশাইও দেখা দিলেন।

যুধিষ্ঠিরবাবুকে রামুর বড় ভাল লাগে। ভারী অমায়িক মানুষ। কথায় কথায় মারধর নেই, ধমক-ধামক নেই। মিষ্টি হেসে নরম সুরে বোঝান, না পারলে রাগ করেন না। আজও রামুকে জিজ্ঞেস করলেন, "মুখোনা ভার দেখছি যে। বকুনি খেয়েছ নাকি?"

"আজ কিছু ভাল লাগছে না মাস্টারমশাই।"

"সকালবেলায় কিছু ভাল না লাগলে সারা দিনটাই খারাপ যায়। সকালটাই তো মানুষের সবচেয়ে সুন্দর সময়।"

যুধিষ্ঠিরবাবুর পরনে ধপধপে ধুতি। গরম কাপড়ের নস্যি রঙের পাঞ্জাবির ওপর শাল। তার চেহারাখানাও বেশ লম্বা চওড়া। বয়স বেশি নয়। চোখের দৃষ্টি সব পরিষ্কার আর তীক্ষ্ম। অগাধ জ্ঞান। রামু শুনেছে যুধিষ্ঠিরবাবু খুব বড়লোকের ছেলে। বাবার সঙ্গে

রাগারাগি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। নইলে তার যা অবস্থা তাতে রোজগার না করলেও চলে।

রামু গম্ভীর হয়ে বলে, "আজ যদি না পড়ি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?"

"না না। বোজ কি পড়তে ভাল লাগে?"

"কিন্তু বাবা তো বকবে?"

"না, তাও বকবেন না। চলো, তোমার দাদা আর দিদিদের পড়া দিয়ে তোমার সঙ্গে বসে আমি কাটাকুটি খেলব।"

"সত্যি খেলবেন?"

"কেন খেলব না? চলল।"

বাস্তবিকই যুধিষ্ঠির মাস্টারমশাই আর সকলকে শক্ত-শক্ত টাস্ক করতে দিয়ে একটা রাফ খাতা খুলে রামুর সঙ্গে কাটাকুটি খেলতে লাগলেন। কিন্তু কাটাকুটিও উনি এত ভাল খেলেন যে, রামু বারবার হেরে যেতে লাগল।

যুধিষ্ঠিরবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, "তোমার হাত কাটল কী করে?"

"আমাদের পাখিটা কামড়ে দিয়েছে।"

"সেই কাকাতুয়াটা?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কী করেছিলে?"

"ছেড়ে দিচ্ছিলাম।"

“পাখিটাকে?”

“হ্যাঁ। আমাকে বড় জ্বালাতন করে।” যুধিষ্ঠিরবাবু একটু চমকে উঠে বলেন, ছেড়ে দিয়েছ?”

“না, শিকলটা খুলতে পারিনি।”

এরপর আর কোন কথা হল না বটে কিন্তু যুধিষ্ঠিরবাবু বারবার কাটাকুটি খেলায় হেরে যেতে লাগলেন। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কাটাকুটি খেলার ঘটনা এবং পাখিটাকে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টার কথা রামুর দাদা আর দিদিরা বাড়িতে বলে দিল। উদ্ধববাবু কাঁচারিতে যাওয়ার আগে রামুকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে আনলেন।

গম্ভীর হয়ে বলছেন, “পাখিটা তোর সঙ্গে কোনো শত্রুতা করেছে?” রামু ভয়ে কাঠ। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

উদ্ধববাবু তার বেতের ছড়িটা দিয়ে শপাৎ করে এক ঘা মেরে বললেন, “দুনিয়ার সবাইকে শত্রু মনে করতে কে তোমাকে শেখাল?

রামু যন্ত্রণায় ছটফট করে বাঁ হাতের কবজি চেপে ধরল। বেতটা লেগেছিল সেইখানেই।

“বলো!” আবার শপাং। এবার লাগল কোমরে। রামু বেঁকে গিয়ে বলল “পাখিটা আমাকে ধমকাচ্ছিল।”

“বটে! পাখির ধমকে তোমার এমন অপমান হয়েছে যে, শিকলি কেটে তাকে উড়িয়ে দিতে হবে?”

আবার শপাং। এবার পিঠের চামড়াই বুঝি কেটে গেল রামুর। সে একটা চিৎকার করতে গিয়েও দাঁত চেপে রইল। বাবার সামনে কান্না বারণ। তবে সে চাপা কান্নায় থরথর করে কাঁপছিল। রাগেও।

উদ্ধববাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, "পাখিটা আমার প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে শাসন করবে। কথাটা মনে রেখো। যদি কখনো ফের এরকম কিছু করো তবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব। আর শুনলাম পড়ার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কাটাকুটি খেলছিলে আজ! সত্যি?"

"মাস্টারমশাই নিজেই তো খেললেন।"

"সেক্ষেত্রে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু মাস্টারমশাইরা কোন ধরনের ছাত্রের সঙ্গে কাটাকুটি খেলেন তা জানো? যাদের কিছু হবে না বলে ওঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে যান। তোমারও কিছু হবে না। এখন যাও।"

চোখ মুছতে মুছতে রামু বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

উদ্ধববাবুর কড়া হুকুম আছে কোনো ছেলেকে তিনি যেদিন শাসন করবেন যেদিন সেই ছেলের খাওয়াও বারণ। তাতে নাকি ফল ভাল হয়। সুতরাং রামুকে আজ খালি পেটে ইস্কুল যেতে হল।

ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসে গান্টু কাঁচা কুল খাচ্ছিল নুন দিয়ে। স্যার এখনো আসেননি।

রামু গিয়ে পাশে বসতেই গান্টু চাপা গলায় বলে, "খুব ভোলাই খেয়েছিস

রামু আবার চোখের জল মোছে।

'দূর, আমি তো কত মার খেয়েছি। কাকা এখনো মারে। তবে এখন আর লাগে না।"

রামু অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "শোন গান্টু, আমি ঠিক করেছি সার্কাসের দলে নাম লেখাব।"

"সার্কাস!"

"আমার লেখাপড়া হবে না। কিছু হবে না।"

“সার্কাসে গেলে নেবে কেন? ঝাড় দেওয়ার কাজ করবি?”

“না। খেলা দেখাব।”

“পারবি?”

“শিখব।”

১১-১৫. অনেক ভেবে চিন্তে গান্টু বলল

অনেক ভেবে চিন্তে গান্টু বলল "আমি সারকাসে যাব না। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াব।"

রামু বলে, "জাহাজে চাকরি পাওয়া অত সোজা নয়। তোকে নেবে কেন? তুই সাঁতার জানিস?"

"শিখে নেব। তোকে সারকাসে নিলে আমাকে জাহাজে নেবে।"

"তাহলে পালাবি?"

"পালাব। কিন্তু গাড়িভাড়ার কী হবে? রাস্তায় খাব কী?

"সে হয়ে যাবে। আমি তো সারকাসের দলের সঙ্গে যাচ্ছি আমাকে ওরাই খেতে-টেতে দেবে।"

"আমি যদি তোর সঙ্গে থাকি তো আমাকেও নেবে?"

"সেটা এখুনি বলতে পারছি না। কথা বলতে হবে।"

ক্লাসের ফাঁকে-ফাঁকে গান্টুর সঙ্গে নানারকম পরামর্শ করে রামু বাসার ফিরল। সারাদিন খাওয়া নেই। টিফিনে গান্টু একটু চিনেবাদামের ভাগ দিয়েছিল মাত্র। তাতে খিদেটা আরো চাগিয়ে উঠেছে। পেটের আগুনটা রাগের হকা হয়ে মাথায় উঠে আসছে। বইটই রেখে রামু নিঃসাড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকল। বাগানের এক কোণে একটা কুলগাছ আছে। তাতে মত্ত-মত টোপাকুল খেয়ে খিদেটা চাপা দেবে।

কিন্তু গিয়ে দেখে, কুন্দ দারোগার দুই ছেলে আন্দামান আর নিকোবর চুরি করে বাগানের দেয়াল টপকে ঢুকে গাছে উঠে কুল সব সাফ করছে। একজনের হাতে আবার একটা বাঁশের চ্যাঙড়ি। সেটা টোপাকুলে টপটপে ভর্তি।

রামু হাঁক মারল, "অ্যাই! আমাদের গাছে উঠে কুল পাড়ছিস যে বড়!"

কুকুসুমের শাসন বড্ড কড়া। কুল চুরির কথা জানাজানি হলে আস্ত রাখবে না। ভয়ের ব্যাপার আরো আছে। রামুর ঢিল ছোঁড়ার হাত দারুণ পাকা। এখন নীচ থেকে সে যদি ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে তবে গাছের ওপর দুই ভাইয়ের বড়ই বিপদ। রামুর ঢিল বড় একটা ফশকায় না। তাই দুই ভাই ওপর থেকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, "বলিস না, ভাই বলিস না। অন্যায় হয়ে গেছে। তোকে অর্ধেক দিচ্ছি। পায়ে পড়ছি, ঢিল মারিস না।"

খিদে-পেটে রামুর গাছে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তাছাড়া এ বাড়ির ওপর তার এখন এমন রাগ যে, এই বাড়ির কোন ক্ষতি হলে সে গম্ভীর হয়ে বলল, "ঠিক আছে, নেমে আয়।"

আন্দামান আর নিকোবর পকেটে করে কাগজের পুরিয়ায় অনেকটা ঝাল নুন এনেছে। তাই নিয়ে গাছতলায় তিনজনে কুলের ভোজে বসে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে তিনজন কুল খেয়ে গেল। পাকা, আধ-পাকা ডাঁশা কুল আর দুর্দান্ত ঝালের শোঁসানি শোনো যাচ্ছিল কেবল। তারপর নিকোবর বলল, "তুই নাকি সারকাসের দলে ভিড়ছিস?"

রামু কথাটা আর কাউকে বলেনি, গান্টু ছাড়া। তাই চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে বলেছে?"

"গান্টু। স্কুল থেকে ফেরার পথে বলল, রামু সারকাসের দলে চলে যাচ্ছে।"

আন্দামান মুখ থেকে একটা কুলের বিচি ফুড়ুক করে ফেলে বলল, ওই সারকাসে একটা সাঙ্ঘাতিক খুনি লোক আছে। দিনে-দুপুরে মানুষ খুন করে।”

রামু বলে “কে বল তো?”

“যে লোকটা আজকাল সাপের খেলা দেখায়। মাস্টার লখিন্দর।”

“লোকটা খুনি কী করে জানলি?”

“বাবা গতকাল ফন্তুবাবুকে বলছিল, আমি আড়াল থেকে শুনেছি।”

“ফন্তুবাবুটা কে?”

“পুলিসের ইনফর্মার।”

“কী বলছিল?”

“বলছিল লখিন্দরের নাম নাকি আসলে লখিন্দর নয়। এ হচ্ছে মাস্টার গোবিন্দ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই বলে একটা লোককে খুন করে জেলে যায়। তার ফাঁসির হুকুমও হয়েছিল। কিন্তু লোকটা জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।”

“তবে তোর বাবা তাকে ধরছে না কেন?”

“ধরা যাচ্ছে না লোকটা মুখোশ পড়ে থাকে তো। আসল চেহারাটা কেউ দেখেনি। সারকাসওয়ালারা অন্য একটা লোককে দেখিয়ে বলছে, এই হচ্ছে মাস্টার লখিন্দর।”

“তাহলে তোর বাবা এখন কী করবে?”

“কিছু করবে না। শুধু ওয়াচ করা হবে। মাস্টার গোবিন্দর সব খোঁজ খবর চেয়ে পাঠানো হয়েছে। পুলিস ফোর্সও আসছে। শহরটা ঘিরে ফেলা হবে। এখন ইনফর্মার আর সেপাইরা চারদিকে নজর রাখছে। গতকাল থেকে সারকাসে সাপের খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বিরাট

নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে–মাস্টার লখিন্দর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। সাপের খেলা বন্ধ রইল। সব প্ল্যান করা।”

আর কয়েকটা কুল খেয়ে রামু উঠে পড়ল। আন্দামান আর নিকোবর তাকে অর্ধেক কুলের ভাগ দিতে চাইলে রামু ঠোঁট উল্টে বলল, “তোরা নিগে যা।”

সন্ধ্যেবেলা গবা পাগলার ঘরে গিয়ে তাকে ধরল রামু “গবাদা! শুনেছ হবিগঞ্জের সারকাসের সেই সাপ-খেলোয়াড় লখিন্দর নাকি আসলে খুনি?”

অন্যমনস্ক গবা বলল “হ্যাঁ, খুব গুণী।”

“গুণী নয় গো, সে নাকি খুনি।” গবা অবাক হয়ে বলে, “তোমাকে কে বলল?”

“আন্দামান আর নিকোবর। কুন্দ দারোগার যমজ ছেলেরা।”

“বটে!” বলে গবা আঙুল দিয়ে তার দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, “খুন একটা হয়েছিল বটে। সেই কাশিমের চরে। গেলবারের আগের বারে শীতকালে। জায়গাটা এখান থেকে খুব দূরেও নয়। বিশ-পঁচিশ ক্রোশ হবে। খুব জ্যোৎস্না ছিল সেই রাতে।”

“তুমি সেখানে ছিলে?”

“খানিকটা ছিলাম বই কী। কাশিমের চরেই যে সেই রাতে তেনাদের নামবার কথা।”

“কাঁদের?”

“আলফা সেনটরি হল সৌরলোকের সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্র। দূরত্ব হবে চার আলোবছর। সেখানকার একটা উন্নত গ্রহের সঙ্গে আমার অনেকদিনের যোগাযোগ। বহুকাল খবর-বার্তা দিইনি বলে চিন্তা করছিল তারা। আমাকে একদিন একটা ভাবসংকেত পাঠাল। যন্ত্রপাতি দিয়ে নয়, স্রেফ জোরালো মানসিক প্রক্রিয়ায়। জানান

দিল, দিন-দুইয়ের মধ্যেই তারা এক পূর্ণিমার রাতে কাশিমের চরে নামবে। আমি যেন সেখানে হাজির থাকি।”

“গুল মারছ গবাদা!”

“গবা তো কেবল গুলই মারে। আর বলব না, যাও।”

“আচ্ছা আচ্ছা, গুল নয়। বলো।”

“শেষ পর্যন্ত অবশ্য সময়মতো তারা আসতে পারেনি। পরে শুনলাম ওদের মহাকাশযানের একটা মাস্তুল নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।”

‘মাস্তুল তো নৌকায় থাকে।”

“আরে বাবা এ কি আর সাধারণ মাস্তুল! এই মাস্তুল হল আসলে একটা সুপারসেনসিটিভ স্ক্যানার।”

“যাকগে, তারপর কী হল?”

“সে এক কাণ্ড। আমি তো কাশিমের চরে জোৎস্নায় একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমে ঢুলে পড়ছি। কখন তেনারা আসবেন। কাশিমের চর জায়গাটা বড় ভাল নয়। একধারে ঘন জঙ্গল, মাঝখানে নদী। শীতকাল বলে জল প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। দু ধার দিয়ে তিরতির করে নালার মতো দুটো স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে মস্ত চর। তা সেই চরেও আবার কাশফুলের ঘন ঝোঁপ সব। মাঝখানে অবশ্য অনেকটা জায়াগ ফাঁকা। সন্ধ্যের পরই সোনার থালার মতো চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নায় একেবারে মাখামাখি। আর যা শীত পড়েছিল সেবার তা আর বলার নয়।”

“উঃ প্রকৃতি-বর্ণনা রেখে আসল গল্পটা বলবে তো!”

"তোমার বাপু বড় ধৈর্য কম। গল্পের আসল প্রাণই তো ঐ প্রকৃতি আর পরিবেশের ওপর। ওটা না হলে গল্পটা বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া হয়ে যায় যে। সত্যি বলে মনে হয় না।"

"তারপর কী হল?"

"সে এক কাণ্ড। আমি তো সেই শীতে একেবারে জড়সড়ো হয়ে ঠাণ্ডা মেরে বসে আছি। চারদিকে বেশ কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে জ্যোৎস্নার একটা আলাদা রূপ আছে। গোটা জায়গাটাকে মনে হচ্ছিল পরীর রাজ্য। দেখতে দেখতে রাত বেড়ে উঠল। ঘুমে আমি ঢুলে পড়ছি। এমন সময় মনে হল একটা লোক যেন দূর থেকে দৌড়ে আসছে। বালির ওপর তো পায়ের শব্দ হয় না। কিন্তু আমি সেই মহাকাশের লোকগুলোর ভাবসংকেত পাওয়ার জন্য মনটাকে এমন চনমনে রেখেছিলাম যে, উঁচ পড়লেও শব্দ শুনতে পাব।"

"তবে এই যে বললে ঘুমে ঢুলে পড়ছিলে!"

"তা বটে। তবে কিনা সে-ঘুমও ভাবের ঘুম। চোখ বোজা থাকে বটে, কিন্তু কান, গায়ের চামড়া, নাক, চারদিকের খবর পায়।"

"লোকটা দৌড়ে কোথায় গেল?"

"গেল না। লোকটা আসছিল। আমি চোখ চেয়ে কুয়াশায় কাউকে দেখতে পেলাম না। তবে কয়েক সেকেণ্ড পরেই আরো চার-পাঁচজনের দৌড়ে আসার আওয়াজ পেলাম। তারপর বুঝলাম প্রথম লোকটা পালাচ্ছে, পরের লোকেরা তাকে তাড়া করছে। প্রথম পায়ের শব্দটা ঝোঁপের আড়ালে-আবডালে বেড়ালের মতো চুপি চুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। অন্য লোকগুলো তাকে খুঁজছে।"

"তুমি কী করলে?"

"আমি একটা হাই তুললাম তখন।"

“মাত্র হাই তুললে?”

“না, দুটো তুড়িও দিয়েছিলাম মনে আছে।”

“ধুস, তারপর কী হল?”

“ওঃ, সে এক কাণ্ড!”

.

১২.

বিরক্ত হয়ে রামু বলে, “আঃ, বলোই না!”

ভাবলে আজও গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়। দ্যাখো না, আমার বোর)

গা দ্যাখো!” বলে গবা হাতে দাঁড়ানো রোঁয়া দেখাল রামুকে।

তারপর বলল, “কুয়াশা আর জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝোপেঝাড়ে সেই লুকোচুরি খেলা চলছে, আর আমি বসে আছি। ব্যাপার কী তা বুঝতে পারছি না। একবার হঠাৎ একটা শেয়াল এক ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফ মেরে সাঁ করে ছুটে পালাল।

“তারপর?”

তারপর সেই ঝোঁপের আড়াল থেকে ধুতি পরা একটা লোক ব্যাপারে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এসে অবিকল শেয়ালের মতোই দৌড়ে পালাচ্ছিল। তার চেহারাটা বিশাল। ছ’ফুটের ওপরে লম্বা, ইয়া কাঁধ, ইয়া বুকের ছাতি। সেই ঝুমকো আলোয় মুখটাকা লোকটাকেও কিন্তু আমি চোখের পলকে চিনে ফেললাম।”

“লোকটা কে?”

"সেই লোকটাই পাড়ুই। ওরকম লোক আমি জন্মে দুটো দেখিনি। হরিহর পাড়ুই না-পারে এমন কোনো কাজ নেই। লোকের ছেলেমেয়ে চুরি করে আড়কাঠিদের কাছে বেচে দিত, নয়তো মা-বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। ডাকাতি করত। চুরি করত। আর খুন করা ছিল তার জলভাত। ওই তল্লাটে তার দাপটে সবাই কঁপত।"

"লোকটা কী করল?"

"লোকটা তখন পালাচ্ছিল। খুব অদ্ভুত দৃশ্য। হরিহর পাড়ুইকে পালাতে দেখাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ সাধারণত তাকে দেখেই অন্যেরা পালায়। তাই তাকে পালাতে দেখে ভারী অবাক লাগল। কাশিমের চরে এমনিতে ঘরবাড়ি নেই, তবে বহুকাল আগেরকার একটা ভাঙা বাড়ি আছে, সাপখোপ শেয়াল তক্ষক বাদুড় আর পাচার আচ্ছা। চোরে-ডাকাতেও বড় একটা কেউ সেই বাড়িতে ঢোকে না। আমি যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে একটু ডাইনে কোনাকুনি একটা ঝাউবন। তার আড়াল থেকে সেই ভাঙা বাড়িটার একটা গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। নিকষ্যি অন্ধকার। হরিহর পাড়ুই কোলকুঁজো হয়ে সেই ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে বাড়িটার দিকে যাচ্ছে বলে মনে হল। এমন সময়ে দেখি, গম্বুজে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। কে যেন উঁচু থেকে একটা টর্চবাতি জ্বালছে আর নেভাচ্ছে। আমার মনে হল, ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার।"

"তোমার ভয় কর না?"

"না, ভয়ের কী? দুনিয়াটাই তো নানা খারাপ জিনিসে ভরা। ভয় পেতে শুরু করলে তার আর শেষ নেই।"

"তুমি কী করলে?"

"উঠে হরিহরের পিছু পিছু এগোতে লাগলাম। সেটাও দুঃসাহসের কাজ। হরিহর যদি টের পায় তাহলে চোখের পলকে আমার ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে কসাই-ছুরি দিয়ে। তার কাছে সব সময় অস্ত্রশস্ত্র থাকে। স্বভাবটাও কেমন পাগলা খুনির। তাই খুব ঠাহর করে

দেখে-শুনে সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। কিন্তু ঝাউবনের মধ্যে আলো আঁধারিতে আর তাকে দেখতে পেলাম না। গম্বুজের বাতিটাও আর জ্বলছে না তখন।”

রামু চোখ বড়-বড় করে বলে, “তখন কী করলে?”

“কিছু করার নেই। চারদিক ঠাহর করছি। লোকটা তো আর নেই হয়ে যেতে পারে না। ঝাউবনের প্রথম দিকটায় বেশ পরিষ্কার। ঝোঁপজঙ্গল তেমন নেই। কিন্তু ভিতর দিকটায় মেলা আগাছা হয়েছে, লুকিয়ে থাকার পক্ষে তোফা জায়গা। আমি একটা কাঁটাঝোঁপের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে বসে চারদিকে দেখছি, এমন সময়

“এমন সময়? উঃ, বলো না!”

“বলছি দাঁড়াও। হাঁ করতেই গলায় একাট মশা চলে গেল যে!” খক খক করে কেশে গলা সাফ করে গবা বলে, “বেশ নিঃঝুম। আলোর চিকড়ি মিকড়ি। শীত। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা লম্বা হাত কোত্থেকে বেরিয়ে

এসে ঘপাত করে আমার ঘাড়টা ধরল।”

“বলো কী?”

“ওরে বাবা, সে-কথা ভাবতে আজও গায়ে কাটা দেয়। এই দ্যাখো ফের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।”

“তারপর কী হল?”

“আমি তো কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। আর হাতটাও পেল্লায়। এই মোটা-মোটা আঙুল, কুলোর মতো মক্ত পাঞ্জা। সেই হাতের একটু বেকায়দা বেশি চাপ পড়লে আমাদের মতো সাধারণ ঘাড় মট করে ভেঙে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাতটা আমার ঘাড় ধরল কিন্তু তেমন আঁট করে ধরল না। বরং মনে হচ্ছিল, মস্ত হাতটা আমার কাঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে।

কিন্তু আমি সেই ভাবেই তখন কুঁই-কুঁই করছি। টের পেলাম হাতটা সামনের কাটাঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরেছে। হাতটা মানুষের না অন্য কিছুর তা তখন বুঝতে পারছি না।”

“মানুষ নয়?”

“তখন তা বুঝবার মতো মনের অবস্থা নয়। তবে হঠাৎ ঝোঁপের ভিতর থেকে একটা খসখসে শ্বাস টানা শব্দ পেলাম। আমি তখন ভয়ে একেবারে পাথর। হঠাৎ সেই পেল্লায় হাত আমার ঘাড়ে একাট ঝাঁকুনি দিয়ে, আস্তে আস্তে ঝোঁপটার মধ্যে টেনে নিতে লাগল। সাঙ্ঘাতিক কাটাঝোঁপে আমার গাল নাক কান ছড়ে যাচ্ছে। চোখেও কাঁটা ঢুকে যেতে পারে। আমি দুহাত দিয়ে চোখটা আড়াল করলাম। তারপর ডালপালা-সমেত মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। দেখি কী, কাটাঝোঁপের মধ্যে একটা লোক শুয়ে আছে। চারদিকে রক্তে ভেজা।”

“ওঃ বাবা!”

“বাবা বলে বাবা! আমি তো তখন বাবা ছেড়ে ঠাকুর্দাকে ডাকতে লেগেছি।”

“হল কী বলো না!”

“তেমন কিছু নয়। লোকটার তখন প্রায় হয়ে গেছে। বুকে মত ক্ষত। তা থেকে বগবগ করে রক্ত পড়ছে। লোকটার গলায় ঘড়ঘড়ানি উঠে গেছে। লোকটা কোনোক্রমে বলল, পাখি জানে। পাখি সব জানে। এইটুকু বলেই লোকটা ঢলে পড়ল।”

“লোকটা কে?”

“আর কে? সেই হরিহর পাড়ুই। তখনো মরেনি, কিন্তু মরছে। কিন্তু আমার অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। মরার সময় কী করে জানি না পাড়ুইয়ের হাতটা আমার ঘাড়কে শক্ত করে ধরল। কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। ওদিকে কাছাকাছি অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে

পাচ্ছি। কারা যেন এগিয়ে আসছে। চারদিকে টর্চের বাতি ঝলসাচ্ছে ফটাফট। যারাই হোক, তারা লোক ভাল নয়। আমার পালানো দরকার। কিন্তু হরিহরের হাতখানা আমাকে অষ্টপাশে বেঁধে ফেলেছে। কার সাধ্য ছাড়ায়! তার ওপর আঙুলগুলো ক্রমে বেঁকে গলায় গজালের মতো ঢুকে যাচ্ছে। মরন্ত মানুষের গায়ে যে অত শক্তি হয় কে জানত বলো।”

“তারপর কী হল? তাড়াতাড়ি বলল।”

“ওদিকে সেই বদমাশগুলোও তেড়ে আসছে। চারদিকে টর্চের আলো ঝলসাচ্ছে। একটা লোক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, সাতনা, ঠিকমতো বল্লম চালিয়েছিলি তো! অন্য একজন রাশভারী গলায় বলল, আমার বল্লম এদিক-ওদিক হয় না। ঝাউবনের ঢুকবার মুখেই লোকটাকে গেঁথেছি। তবে দানোটার গায়ে খুব জোর। বল্লমটা ধাঁ করে টেনে খুলেই দৌড়ে পালাল। কিন্তু মনে হয় না। বেশি দূর যেতে পারবে। চারদিকে রক্তের ছড়া দেখছ না!”

“তখন তুমি কী করলে?”

“আমি? আমি তখন কিছু করাকরির বাইরে। হরিহরের কজায় আমার পুটিমাছের পরাণ ধড়ফড় করছে। আস্তে-আস্তে চেতন ভাবটা চলে যাচ্ছে। শ্বাস প্রায় বন্ধ। ঠিক এই সময়ে লোকগুলো “ঐ যে’ বলে চেঁচিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাদের।”

“তুমি বেঁচে গেলে বুঝি!”

“আরে দূর! অত সহজ নাকি? লোকগুলো টর্চ জ্বেলে দৃশ্যটা দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, এখনো বেঁচে আছে! সর্বনাশ। শেষ করে দে। শেষ করে দে। বলতে বলতে একাট লোক মঙ দা বের করে প্রথম কোপটায় হরিহরের গলা নামিয়ে দিল।”

“বলো কী? আর তুমি?”

"আর যারা ছিল তারা বলল, এ লোকটা কে রে? আর একজন বলল, যেই হোক, সাক্ষী রেখে লাভ নেই। লোকটা বেঁচে আছে। গলাটা নামিয়ে দে। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা লোক ঘচাত করে আমার গলাটাও নামিয়ে দিল।"

"যাঃ, কী যে বলো!"

"যা বলছি শুনে যাও। একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা, দুনিয়ার আর কোনো মানুষের এমন অভিজ্ঞতা নেই। স্পষ্ট নিজের কাটামুণ্ডু প্রত্যক্ষ করলাম। বুঝলে! গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত পড়ছে। ধড়টা একটু ছটফট করছে। কিন্তু মুখোনা দিব্যি হাসি-হাসি।"

"গুল মারছ গবাদা।"

"সত্যি না। তারপর হল কী শোনো। সে এক কাণ্ড।"

"বলো।"

"ওরা তো আমাদের বন্ধ করে রেখে পালিয়ে গলে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসলাম। বারবার গলায় হাত বোলাচ্ছি। কিন্তু সেটা তো আমার গলা নয়। শরীরটা তখন বাতাসের মতো হালকা পাতলা জিনিস হয়ে গেছে। দেখি ঝোঁপের ওপাশ থেকে হরিহর পাড়ুইও উঠে পড়ে চারদিকে কটমট করে চাইছে। তার চাউনি দেখে ভয় খেয়ে পালাতে গিয়ে মনে হল, এখন আর ওকে ভয় কী? আমিও একটু ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। হরিহর আমাকে পছন্দ করছিল না। কাছে যেতেই একটা হুংকার দিল, খবরদার! আমি খিক করে হেসে বললাম, তোমার আর সেই দিন নেই হে হরিহর। মাথা গরম কোরো না বাবা। তার চেয়ে চলো চাঁদের আলোয় চরে বেড়াতে-বেড়াতে দুটো সুখদুঃখের কথা কই। হরিহর প্রথমটায় একটু গোঁ ধরে বসে ছিল। তারপর যখন সত্যিই বুঝল যে, সে মরে গেছে, তখন আমার সঙ্গে মিশতে আপত্তি করল না তেমন।"

"মরে গিয়ে তুমি ফের বেঁচে উঠলে কী করে?"

"সে তো আর-এক গল্প। আলফা সেনটরির গ্রহ থেকে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা ভোর-রাত্রে এসে আমার দশা দেখে চটপট মাথাটা জুড়ে দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলল যে।"

"যত সব গুল। কিন্তু পাখি কী জানে তোত বললে না?"

হাঁ। সেইটেই তো আসল গল্প। আর একদিন হবে' খন। "

.

১৩.

রামু সঙ্গে-সঙ্গে গবার হাত ধরে বলে, "না, না, বলো। বলতেই হবে।"

গবা মাথা চুলকে বলে, "আসলে কী জানো, বেশ কিছুদিন আগেকার কথা কিনা, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তার ওপর আমার মাথাটা কাটা গিয়েছিল তে, তাতেও বুদ্ধি একটু ঘুলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় কাশিমের চরে হরিহরের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমার যে-সব কথা হয়েছিল তার মধ্যে পাখির কথাটা আসেনি। মনে আছে আমরা সেই গলা কাটনেওলা লোকগুলোর আক্কেল নিয়ে কথা বলছিলাম। হরিহর একবার ভুল করে একটা মশা মারতে গিয়েছিল তাও মনে আছে। হাওয়া হাত দিয়ে কি আর মশা মারা যায়? দুজনে খুব হেসেছিলাম। কী হয় জানো, মরলে পর আর পুরনো শত্রু, রাগ, হিংসা এ-সব থাকে না। বেঁচে থেকে মানুষ যে-কাণ্ডমাণ্ড করে সেগুলোকে ভারী ছেলেমানুষি মনে হয় তখন। বাঁচা অবস্থায় তো আমি হরিহরকে কতই না সমঝে চলছিলাম, মরার পর আবার সেই হরিহরের সঙ্গেই চাঁদের আলোয় গলা-ধরাধরি করে বালির ওপর কত ঘুরলাম।"

"পাখির কথাটা তুললে না?"

"ঐ যে বললাম, বাঁচা অবস্থায় কৌতূহলগুলো পর্যন্ত মরার সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়।"

"পাখিটা তবে কি জানত?"

"সেটা ভেবে দেখতে হবে!"

"আর হরিহরকে সেদিন খুনই বা করল কারা? তাদের তুমি চেনো?"

"কস্মিনকালে না।"

"মাস্টার গোবিন্দকে তাহলে পুলিস ধরল কেন?"

"এমনি-এমনি ধরেনি। গোবিন্দরও দোষ আছে।"

"কী দোষ?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গবা বলে, "সে আবার আর-এক গল্প।"

"তাহলে গল্পটা বলে ফেল।"

"সেটা একদিন গোবিন্দর কাছেই শুনে নিও। আজ মেলা বকবক করে ফেলেছি।"

"গোবিন্দর কাছে কবে আমাকে নিয়ে যাবে?"

"আমি এখন তার কাছেই যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো। তবে খবর্দার, ঘুণাক্ষরেও কাউকে বোলো না যেন। জানাজানি হলেই পুলিস গবাকে ধরে নিয়ে গারদে পুরবে।"

শহর ছাড়িয়ে মাইলটাক মেঠোপথে হাঁটলে একটা বেশ সমৃদ্ধ গাঁ। সন্ধ্যের একটু আগে সেই গাঁয়ের এক সম্পন্ন গেরস্তবাড়িতে রামুকে নিয়ে হানা দিল গবা।

গবাকে দেখে বাড়ির সবাই তটস্থ। "আসুন, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।"

নিকোনো উঠোনে জলচৌকি পেতে দেওয়া হল। ঘটির জলে হাতমুখ ধুয়ে এসে রামু আর গবা পাশাপাশি দুটো জলচৌকিতে বসতে না বসতেই দুটো ছোটো ধামায় টাটকা ভাজা

মুড়ি, বাতাসা, নারকেল আর দুধ খেতে দেওয়া হল তাদের। সারা দিনে রামুর এই প্রথম সত্যিকারের কিছু খাওয়া। সে যখন হালুম-হুঁলুম করে খাচ্ছে তখন গবা খুব মুরব্রি চালে গেরস্তকে জিজ্ঞেস করল, "গরু রাখার জন্য যে বোবা কালা লোকটাকে দিয়েছিলাম সে কেমন কাজ-টাজ করছে?"

"আজ্ঞে কাজ ভালই করে। খায়ও কম। কিন্তু লোকটা ভারী রাগী।"

"খুব চোটপাট করে বুঝি?"

"গেরস্থ একটু অবাক হয়ে বলে, "বোবা লোক চোটপাট করবে কেমন করে? তা নয়, তবে চোখ দুখান দিয়ে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকায় যে, পেটের মধ্যে গুড়গুড়নি উঠে যায়।"

" লোকটা কোথায়?"

"একটু আগে গোরু নিয়ে ফিরল। এখন গোয়ালে সাঁজাল দিচ্ছে। ডাকাচ্ছি।"

গেরস্তর ছেলে গিয়ে রাখালটাকে ডেকে আনল। পরনে আধময়লা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা মোটা কাপড়ের পিরান, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটির দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, তাকালে বুকের মধ্যে একটু ধুকুর পুকুর হয় বটে।

গবা জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছিস রে?"

লোকটা 'ব ব ওয়াঁ' গোছের কিছু দুর্বোধ শব্দ করল।

গবা মাথা নেড়ে বলে "বেশ বেশ বেশ। তুই তো আবার কানেও শুনিস। তবু বলি, এরা ভাল লোক। এদের কাছে ভাল হয়ে থাকবি। চল, একটু এগিয়ে দিবি আমাদের। আঁধার হয়ে এসেছে, লণ্ঠনটা নিয়ে সঙ্গে আয়।"

শুনে গেরস্তর ছেলেপুলেরা হৈ হৈ করে উঠল। এখুনি যাবে কী গবা জ্যাঠা। আমরা যে তোমার সেই মেছো-ভুতের গল্পটার শেষটুকু শুনব বলে কতদিন ধরে হা-পিত্যেশ করছি. সেই যে গো আন্নাপুরের বড় ঝিলে সেবার মাছ ধরতে গিয়ে জলে একটা বড় কড়াই ভাসতে দেখিছিলে। তারপর সেই ভাসন্ত কড়াইটা যেই কাছে এসেছে অমনি সেটাকে ধরতে গিয়ে হাতে গরম ছ্যাকা খেলে! তারপর দেখলে, কড়াইটা জলে ভাসছে বটে কিন্তু তাতে গরম তেল ফুটছে। তারপর কী হল?”

গবা উঠে পড়ে বলল, “সে আর একদিন হবে। বাবুর বাড়ির ছেলেকে নিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি না ফিরলে রক্ষে থাকবে না।”

রাখালটা লণ্ঠন আর লাঠি হাতে তাদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে এল। মেঠোপথে পা দিয়েই বোবা রাখাল কথা কয়ে উঠল, “গবাদা, ওদিকে কী হচ্ছে?”

“ধুন্ধুমার। পুলিস চারদিকে তোমায় খুঁজছে।”

.

১৪.

একটা শক্ত মামলায় মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়েছেন উদ্ধববাবু। বড়লোক মক্কেল সকালেই বিরাট ভেট নিয়ে হাজির। ফলের ঝুড়ি, মিষ্টির চ্যাঙারি, দৈয়ের হাঁড়ি, বারকোষে মস্ত রুইমাছ,

ধামাভর্তি শীতের সজি। এলাহি কাণ্ড।

মামলায় জিতে উদ্ধববাবুর মনটা আজ ভাল। অন্য একটা মামলায় সওয়ালের ফাঁকে গুনগুন করে ভৈরবী ভেঁজে নিচ্ছিলেন। আদালতে গান গাওয়া নিষিদ্ধ। হাকিমসাহেব গুনগুননি শুনে বারবার এধার-ওধার তাকান, কিন্তু কোত্থেকে গানটা আসছে তা বুঝতে পারেন না। বার দুই তিন হাতুড়ি ঠুকে “অর্ডার অর্ডার” হাঁক দিলেন। প্রতিবারই উদ্ধববাবু

রুমালে মুখ ঢেকে জিব কাটলেন। কিন্তু গান জিনিসটা ভারী অবাধ্য। ভিতরে গানের ফোয়ারা খুলে গেলে তাকে ঠেকায় কার সাধ্য।

অবশেষে বিপক্ষের উকিল উঠে হাকিমকে বললেন, "আমাদের লার্নেড ফ্রেণ্ড উদ্ধববাবুর স্বভাব অনেকটা কোকিলের মতো। বসন্ত সমাসঃ দেখে ওঁর কণ্ঠ কুহু কুহু' রবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কোকিল যেমন কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, উনিও তেমনি ওঁর গানের ডিম এই আদালতে পেড়ে রেখে যাচ্ছেন।"

এই অদ্ভুত সওয়ালে হাকিম ভূ কোচকালেন, লজ্জিত উদ্ধববাবু ঘাড় চুলকোচ্ছেন। আর-এক হাতুড়ি মেরে আদালতকে চুপ করিয়ে উদ্ধববাবুকে বলেন, "আপনার হিয়ারিংয়ের জন্য একটা ডেট নিন। আজ বাড়ি চলে যান।"

হাঁফ ছেড়ে উদ্ধববাবু বেরিয়ে এলেন। বাস্তবিক এতক্ষণ তার হাঁফ ধরে আসছিল, আইঢাই করছিল। পাকা ফোঁড়ার মতো ভিতরে টনটন করছে গান। একটু টুশকি দিলেই বোমার মতো ফেটে পড়বে। সেই টুশকিটা এতক্ষণ দিতে পারছিলেন না।

এজলাসের চৌহদ্দি পার হয়ে রাস্তায় পড়েই গানের ফেঁড়াটায় টুশকি দিলেন উদ্ধববাবু। আর বাস্তবিক সেটা বোমার মতোই ফাটল। হাঁ করে প্রথম তানটা লাগাতেই এত জোর শব্দ হল যে, উদ্ধববাবু নিজেই হকচকিয়ে গেলেন।

শুধু তাই নয়। সেই শব্দে রাস্তার লোকজনও পালাতে লাগল। কাক কা-কা করে উড়ে উড়ে ঘুরতে লাগল। উদ্ধববাবু তাজ্জব হয়ে দেখলেন, তাঁর গানের কোঁড়াটা বোমার মতো ফেটে চারদিকে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে।

ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে যেতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। তারপর উদ্ধববাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন শব্দটা তার গলা থেকে বেরোয়নি। অমন বোমার মতো আওয়াজ খুব বড় ওস্তাদের গলা থেকে বেরোবার কথা নয়। যুক্তি অনুসরণ করলে সন্দেহ থাকে না,

বোমার মতো আওয়াজটা একটা বোমারই কাজ। আর সেটা ফেটেছে উদ্ধববাবুর মাত্র হাত দশেকের মধ্যে।

রাস্তার আর-পাঁচজনের মতো উদ্ধববাবুও দৌড়তে লাগলেন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই। গলায় গানটাও আর ঠেলাঠেলি করছে না।

বাড়িতে এসে নিজের ঘরে শুয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ হাঁফ ছাড়লেন উদ্ধববাবু। ব্যাপারটা কী হল তা বুঝতে পারছিলেন না। বোমাটা এত কাছাকাছি ফেটেছে যে, সেই শব্দে তার মাথাটা এখনও ডোম্বল হয়ে আছে। এমন কী শুয়ে-শুয়ে কয়েকবার ভৈরবীতে তান লাগানোর চেষ্টাও করলেন উদ্ধববাবু। কিন্তু গলার স্বর ফুটল না।

ভিতরের বারান্দা থেকে কাকাতুয়াটা বলে উঠল "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি। দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।"

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার কথা শুনে উঠে বসলেন। মক্কেল যে অঢেল ভেট দিয়ে গেছে, তা ফেলে-ছড়িয়ে খেয়েও শেষ হওয়ার কথা নয়। তাই উঠে ভিতরবাড়ি থেকে একটা রসগোল্লার হাঁড়ি এনে কাকাতুয়াটাকে খাওয়াতে লেগে গেলেন।

কাকাতুয়াটা বেশ চেখে-চুখেই খাচ্ছিল। কয়দিনে পাখিটা উদ্ধববাবুকে খুব চিনেছে। খেতে-খেতে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে উদ্ধববাবুকে দেখছিল। হঠাৎ একটু চাপা গলায় বলল, "কাউকে বোলো না। কাশিমের চরে অনেক মোহর আছে।"

উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "বলিস কী রে?"

"বিশু জানে না। বিশু জানে না।"

"বিশুটা কে বলবি তো।"

পাখি তখন অন্য কথা বলতে লাগল, "রামু, তুমি ভীষণ দুষ্টু। পড়তে যাও। নইলে গোস্লা পাবে।" তারপর আবার স্বর পালটে বলে, "দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।"

চারদিকে চেয়ে উদ্ধববাবু পাখির দাঁড়টা বারান্দা থেকে নিজের ঘরে এনে রাখলেন।

উদ্ধববাবু বিস্তর মামলা-মোকদ্দমা করেছেন। তিনি জানেন, যার কাছে কোনো গোপন খবর থাকে, তার জীবন সর্বদাই বিপদসংকুল। এই পাখিটা নিশ্চিত লুকোনো সম্পদের খবর জানে। এ পর্যন্ত পাখিটার ওপর হামলাও কিছু কম হয়নি। কিন্তু এতকাল কাকাতুয়াটা কাশিমের চরের কথা বলেনি। কেউ যদি কথাটা শুনতে পায়, তবে যেমন করেই হোক হন্যে হয়ে পাখিটাকে হাত করার চেষ্টা করবে। তার জন্য খুন পর্যন্ত করতে পিছপা হবে না।

উদ্ধববাবু আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বিছানায় গা ঢালতেই পিঠের নীচে কী একটা খচমচ করে উঠল। উঠে দেখলেন একটা খাম তাতে ভঁর নাম লেখা।

খাম খুলতেই একটা চিঠি।

মহাশয়, কাকাতুয়াটিকে ফেরত পাইবার জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছিলাম তাহা আপনি কার্যত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বুঝিতেছি সহজ পথে আপনি পাখিটিকে ফেরত দেবেন না। তাহাতে অবশ্য আমাদের কিছুই না, বিপদ আপনারই। আজ আদালতের বাহিরে যা ঘটিল, তাহা একটি নমুনা মাত্র। বোমাটিতে কেবল আওয়াজের মশলা ছিল, ক্ষতিকারক কোনোকিছু ছিল না। আপনাকে আমাদের সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতেই এই কাজ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর যদি কখনো আমাদের বোমা প্রয়োগ করিতে হয়, তবে এবার তাহার মধ্যে মারাত্মক বস্তু সকলই থাকিবে। মনুষ্যজীবন অতীব মহার্ঘ বিবেচনা করিয়া ভালয়-ভালয় পাখিটিকে আমাদের হতে তুলিয়া দিবেন। বেশি কিছু করিতে হইবে না। আপনাদের বাহিরের বারান্দায় আজ রাতে পাখির দাঁড়টা (পাখি সমেত) ঝুলাইয়া রাখিবেন। কোনো

পাহারা রাখিবেন না আমরা যথাসময়ে তাহা হস্তগত করিব। ক্ষতিপূরণ বাবদ যথেষ্ট অর্থও আপনি পাইবেন। ইতি।

এর আগের চিঠিতে 'আমি আমি' করে লেখা ছিল। এই চিঠিতে বহুবচনের 'আমরা।

উদ্ধববাবু চারদিকে চেয়ে দেখলেন শোওয়ার ঘরের তিন দিকেই বড় বড় জানালা। দক্ষিণ দিকে বাগান, পূর্বদিকেও বাগান, উত্তরদিকে কলতলা। পত্রবাহক কোন দিক দিয়ে এসে টুক করে এই অল্প সময়ের মধ্যে জানালা গলিয়ে বিছানায় চিঠিটা ফেলে গেছে, তা অনুমান করা শক্ত। তবে এরা যে বেশ সংগঠিত দল তাতে সন্দেহ নেই।

উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "হুঁ।" পাখিটাও তার হু শিখে গেছে। সেও বলল, "হুঁ।"

উদ্ধববাবু কাকাতুয়ার দিকে চেয়ে দেখলেন পাখিটাও তার দিকেই চেয়ে আছে। বড় মায়া পড়ে গেছে উদ্ধববাবুর। উঠে গিয়ে কাকাতুয়ার পালকে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন "কেন যে বাবা গোপন কথাগুলো শিখতে গেলি। এখন তোরও বিপদ, আমারও বিপদ।"

পাখিটা হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠল, "বিশু, আমাকে মেরো না! মেয়র।"

উদ্ধববাবু চমকে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। না, কেউ কোথাও নেই। পাখিটা পুরনো মুখস্থ বুলিটা বলছে।

আলমারি খুলে উদ্ধববাবু তার বাবার আমলের দোনলা বন্দুকটা বের করলেন। বহুকাল কেউ বন্দুকটা চালায়নি। উদ্ধববাবু বন্দুকটা পরিষ্কার করতে বসে গেলেন।

ভয়ের চেয়ে ভালবাসা অনেক বড়। উদ্ধববাবু ভয়ের কাছ হার নামতে রাজি নন।

.

১৫.

এমনিতে দেখতে গেলে মাস্টার গোবিন্দ বেশ সুখেই আছে। সারাটা দিন গোরু চরান, গেরস্ত বাড়ির অজস্র কাজ মুখ বুজে করে, পেট ভরে খায় আর সন্ধের পর খড়ের গাদায় ঢুকে ঘুমোয়। বোবা কালা হয়ে থাকতে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সেটা সইয়ে নিচ্ছে।

মাঝে-মাঝে বেমক্কা মুখ ফুটে এক-আধটা শব্দ বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ততটা ক্ষতি কিছু হয়নি।

সেদিন গেরস্তর ছেলের বউ এক গামলা ফুটন্ত ভাতের ফ্যান উঠোনের কোণে রেখে খার কাঁচতে গেছে, এমন সময় গেরস্তর ছোট্ট নাতি হামা টানতে টানতে গিয়ে সেই গামলার কান ধরে উঠতে গিয়েছে। গোবিন্দ গোরুগুলোকে মাঠ থেকে নিয়ে আসতে যাচ্ছিল দুপুর বেলা। এই দৃশ্য দেখে বেখেয়ালে 'ইশ, গেল, ছেলেটা গেল' বলে চেঁচিয়ে দৌড়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। ভাগ্যিস কেউ শোনেনি।

আর একদিন গেরস্তর মেজো ছেলে সকালে তাকে ঘুম থেকে তুলে দিতে এসেছিল। তখন একেবারে কাকভোর। আগের রাত্রে যাত্রা শুনেছে বলে ঘুমটা ভোরে খুব গাঢ় হয়েছিল গোবিন্দর। ছেলেটার ডাকাডাকিতে উঠে বসে বলে ফেলেছিল "দুত্তোর, এমন ষাড়ের মতো কেন চেঁচায় লোকে!" ছেলেটা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বলল, "এ কী! তুমি যে বড় কথা বলতে পারো।" গোবিন্দ ফ্যাসাদে পড়ে অনেকক্ষণ বুবু করল বটে, কিন্তু ছেলেটার যেন প্রত্যয় হল না। পাছে লোক জানাজানি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তখন। ছেলেটাকে কিছু-কিছু কথা খুলে বলল গোবিন্দ। রাজি করাল যাতে কাউকে বলে।

বেশ কাটছিল। কিন্তু একদিন সকালবেলা গোবিন্দ দেখল, একাট রোগা খুঁটকো মতো তোক গেরস্তর সঙ্গে উঠোনে বসে কথা বলছে লোকটার চাউনি টাউনিগুলো ভাল নয়। কথা বলতে-বলতে চারদিকে নজর রাখছে। বোঝ যায় কিছু বা কাউকে খুঁজছে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর গোবিন্দ গেরস্তর মেজো ছেলেকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "যে লোকটা এসেছিল সে কে বলো তো!"

“ও হল ফন্তুবাবু।”

“সে আবার কে?”

“দালালি-ফালালি করে। জমি বেচাকেনার কারবার আছে।”

“আর কিছু?”

“আর কিছু তো জানি না।”

“মানুষটা কেমন?”

“তা কে জানে! তবে বাবার কাছে মাঝে-মাঝে আসে।”

“আজ কেন এসেছিল একটু খোঁজ নেবে? যাও, তোমার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো।”

ছেলেটা একটু বাদে ঘুরে এসে বলল, “কে একটা লোক জেলখানা থেকে পালিয়ে এদিকে এসেছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।

গোবিন্দ জেল পালানোর কথাটা ছেলেটাকে বলেনি। শুধু বদমাশ লোক তার পিছনে লেগেছে বলে সে লুকিয়ে আছে। গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল, “তোমার বাবা আমার কথা কিছু বলেননি তো?”

কিছু লোকের স্বভাব হল, বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবে না। ছেলেটা বলল, “দাঁড়াও, গিয়ে বাবাকে বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসি।”

গোবিন্দ তাকে থামিয়ে বলল, “এখন ফের জিজ্ঞেস করলে তোমার বাবার সন্দেহ হবে। থাকগে।”

রামু মাঝে-মাঝে ছুটির দিনে গোরু চরানোর মাঠে খেলা শিখতে আসে। গোবিন্দ লক্ষ করেছে, ছেলেটা যেদিকে মন দেয় সেদিকটায় বেশ ধাঁ করে উন্নতি করে ফেলতে পারে। খালি মাঠে যন্ত্রপাতি ছাড়া রামুকে আর কীই বা শেখাতে পারে গোবিন্দ? তবু যে কয়েকটা মামুলি একসারসাইজ শিখিয়েছিল, তা চটপট শিখে নিল রামু। খেলা শেখার ফাঁকে-ফাঁকে দু-একটা খবরও দিত। সামন্ত বলে দিয়েছে, পুলিশ সারকাসের ওপর নজর রাখছে তো বটেই, কিন্তু ভাবগতিক দেখে মনে হয় পুলিশ ছাড়া অন্যকিছু লোকও সারকাসের আশেপাশে ঘোরা-ফেরা করছে। আর একদিন এসে রামু জানিয়ে গেল, খুব শিগগিরই সারকাস এখান থেকে উঠে যাবে। গোবিন্দ যেন সারকাসের দলের সঙ্গে না যায়। এবার সারকাস যাবে অযযাধ্যার দিকে। পারলে গোবিন্দ যেন সেখানে গিয়ে দলে ভিড়ে যায়।

সারকাসের জন্য প্রাণটা বড় কাঁদে গোবিন্দর। চারদিক থেকে আলো এসে পড়ে, শূন্যে মাটিতে তার বা দড়ির ওপর হরেক রকম খেলা চলে, সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাণ্ডের আওয়াজ–সে যেন এক স্বপ্নের জগৎ। তা ছাড়া সারকাস হল এক বৃহৎ পরিবার। সকলের জন্য সকলে। সেই সারকাসে আর ফিরে যাওয়া হবে কিনা কে জানে!

গোরু চরাতে-চরাতে এইসব ভাবে গোবিন্দ।

একদিন গোরু নিয়ে বিকেলবেলা ফিরছে, হঠাৎ দেখে গেরস্তর বাড়ির সামনে খুব লম্বা আর জোয়ান একটা লোক দাঁড়িয়ে গাঁয়ের আর-একটা লোকের সঙ্গে কী কথা বলছে, গোবিন্দ পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে শুনতে পেল গাঁয়ের লোকটা বলছে, “না, এ-গাঁয়ে খুনি গুণ্ডা বদমাশ আসবে কোথকে? সে সব শহরে থাকে।”

লম্বা লোকটা বলল, “হয়ত পালিয়ে আছে।”

“পালানোর জায়গা কোথায়?”

“আচ্ছা গবা বলে কাউকে চেনো?”

“খুব চিনি। গবা পাগলা হলেন স্বয়ং শিব।”

“তিনি কি এ-গাঁয়ে আসেন?”

“প্রায়ই আসেন। এই তো সেদিন আমার কেলে গোরটার কলেরার মতো হল। গবা পাগলটাকে ডেকে আনতে তিনি এসে এমন এক ভস্ম খাইয়ে দিলেন যে, পরদিন থেকে গোবর একেবারে ইটের মতো এঁটে গেল।”

এই পর্যন্ত শুনে গোবিন্দ বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু মুশকিল হল, এ-লোকটা পুলিশের লোক নয়। লম্বা এবং বিশাল চেহারার এই দানবকে গোবিন্দ চেনে। রয়্যাল সারকাসে লোকটা পাঁচ মন ভার তুলে রোজ লোককে তাক লাগিয়ে দিত। তারপর সে হঠাৎ একদিন সারকাস ছেড়ে উধাও হয়। গোবিন্দ কানা ঘুষো শুনেছে, এই লোকটা অর্থাৎ সাতনা একটা বাজে সঙ্গে পড়ে খুন-কারাপি করে বেড়ায়। কেন সাতনা খারাপ লোকদের দলে ভিড়ল তাও খানিকটা জানে গোবিন্দ। সাতনার সাত বছর বয়সের একটা মা-মরা মেয়ে ছিল। কে বা কারা সেই মেয়েটাকে চুরি করে সারকাস থেকে নিয়ে যায়, তারপর দশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। সাতনার অত টাকা ছিল না। আদরের মেয়েকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সে রয়্যাল সারকাসের মালিকের হাতে পায়ে ধরে টাকাটা ধার হিসেবে চায়। কিন্তু সারকাসের মালিক টাকাটা দেয়নি। কিছুদিন পর কে মেয়েটিকে নাকি কাশীতে ভিক্ষে করতে দেখেছিল। তখন তার জিব কাটা, একটা চোখ কানা। সানা কাশীতে যায়, কিন্তু মেয়েকে পায়নি। সেই থেকে পাগলের মতো হয়ে যায়। কাশিমের চরের কাছে সুলতানপুরের মেয়েটি চুরি যায়। সাতনা নিজের সঙ্গে মেয়েটাকে নিয়ে সারকাসের দলে ঘুরে বেড়াত। মেয়েকে খেলা শেখাত। সেই মেয়ে নিখোঁজ হওয়ায় সে আবার সুলতানপুরে ফিরে আসে। তারপর কী হয়েছে তা আর গোবিন্দ স্পষ্ট জানে না।

এখন সাতনা তার খোঁজ করছে জেনে সে খুব অবাক হল। সাতনার সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা নেই। অবশ্য বন্ধুত্বও নেই। সাতনার সঙ্গে খুব সামান্য একটু চেনাজানা মাত্র ছিল তার।

রাতে খড়ের গাদায় শুয়ে অনেক ভেবেও সে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। তবে সাতনার সঙ্গে হরিহর পাড়ুইয়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল একসময়ে। হরিহর ছিল সুলতানপুরের সুলতান। তার কথায় গোটা গঞ্জ উঠত বসত। কিন্তু সেটা করত ভয়ে। ঐ রকম ভয়ংকর লোক দুটো দেখা যায় না।

গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিল, মাঝরাতে আচমকা ধোঁয়ার গন্ধে উঠে বসল। চোখ কচলে চেয়ে কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল পুরো খড়ের গাদাটার চারপাশে দিয়ে বেড়াজালের মতো আগুনের শিখা উঠে আসছে। ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই আগুনের শিখা দাপিয়ে উঠল আকাশে।

চারদিকে রক্তাভ লেলিহান ভয়ংকর আগুন। গেরবাড়ি থেকে বিকট চেঁচামেচি আসছিল। লোকজন দৌড়ে আসছে।

গোবিন্দ কী করবে বুঝতে পারছিল না। চারদিক দিয়ে আগুন যে ভাবে ঘিরে ধরেছে তাতে পালানোরা কোনো স্বাভাবিক পথ নেই। কিন্তু আর কয়েক

সেকেণ্ডে থাকলেও আগুনে বেগুন-পোড়া হতে হবে।

গোবিন্দ উঠল। পায়ের নীচে নরম ঘড়। তার জন্য শরীরের ভারসাম্য রাখাই দায়। লাফ দেওয়ার জন্য পায়ের নীচে শক্ত মাটি দরকার।

গোবিন্দ কিছু না-ভেবেই মাথার ওপর থেকে টেনে এক পাঁজা খড় সরিয়ে ফেলল। মাঝখানের শক্ত খুঁটিটা দেখতে পেয়ে কাঠবেড়ালির মতো সেটা বেয়ে উঠে এল একদম

ওপরে। খুঁটিটার মাথায় দাঁড়ানোর জায়গা নেই। কোনক্রমে পায়ের পাতা রাখা যায় মাত্র। কিন্তু সারকাসের খেলোয়াড়ের কাছে তা যথেষ্ট।

গোবিন্দ প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু খুঁটির মাথায় দাঁড়িয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে জীবনের সবেচেয় বড় লাফটা মারল।

১৬-২০. লাফের চোটে গোবিন্দ

লাফের চোটে গোবিন্দ তিরিশ ফুট খুঁটির ওপরে আরও চারফুট উঁচুতে উঠে গেল। ধনুকের মতো বাঁকা পথে আগুনের বেড়াজাল টপকে গিয়ে পড়ল আরও অন্তত সোল সতেরো ফুট দূরে। অন্য কেউ হলে এই বিশাল লাফের পর মাটিতে আছড়ে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে থাকত। কিন্তু গোবিন্দ পড়ল বেড়ালের মতো প্রায় নিঃশব্দে, এবং বিনা দুর্ঘটনায়।

পড়ে সে আগুনের দিকে চেয়ে দেখছিল। এত বড় আগুন সে বহুকাল দেখেনি। গেরস্তর খড়ের গাদাগুলো সবই বিশাল। আগুনটাও তেমনি বিকট হয়ে আকাশ ছুঁয়ে চলেছে। তার চেয়েও বড় কথা, একটু দূরে-দূরে আরও দুটো খড়ের গাদা আছে। আগুনটা যেরকম ফুলকি ছড়াচ্ছে, আর শিখা যেমন উত্তরে বাতাসে দক্ষিণামুখো বেঁকে যাচ্ছে, তাতে আর দুটো গাদা আর গেরস্তর বাড়িতেও আগুন ধরল বলে।

গেরস্ত তার বাড়ির মেয়েপুরুষ মিলে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে “গেল, গেল সব গেল! জল দে, জল দে শিগগিরি।”

কিন্তু এই শীতে টানের সময় খালবিল শুকিয়ে দড়ি। কুয়োর জল পাতালে। এই বিশাল আগুন নেভানো সহজ কর্ম নয়। মুনিশরা লাঠি দিয়ে খড়ের গাদায়। পেটাপটি করেছিল বটে, কিন্তু আগুনের তাতে ঝলসে সবাই হটে এল।

অত আগুনের আলোয় চোখ ঝলসে গেছে বলে গোবিন্দর হনুমান লাফটা কেউ লক্ষ করেনি। গেরস্ত বুক চাপড়ে চিৎকার করে বলছিল, বোবা-কালা অবোধ লোকটা সেদ্ধ হয়ে গেল রে। আহা বেচারি চেঁচানোরও সময় পায়নি।

গোবিন্দ পড়েছিল বেগুন-খেতের মধ্যে। সামনে ডালপালার বেশ উঁচু বেড়া। সুতরাং তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এই সময়ে হঠাৎ গোবিন্দর মাথায় একটি বুদ্ধি এল। খড়ের

গাদায় আগুন লেগে সে মরেছে, একথাটা প্রচার হয়ে গেলে কেমন হয়? যারা তাকে মারতে চেয়েছিল তারা অন্তত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

গা-সুদ্ধ লোক আগুন দেখতে ধেয়ে আসছে। গোবিন্দর উচিত ছিল এই অবস্থায় গেরস্তকে কিছু সাহায্য করা। কিন্তু সে দেখল, এই আগুনকে কজায় আনা তার অসাধ্য। গেরস্তর কপাল ভাল থাকলে বাঁচবে।

এই ভেবে গোবিন্দ হামাগুড়ি দিয়ে বেগুন-খেতের পিছনে বাঁশের বন ডিঙিয়ে বাঁশবনে পড়ল। জিনিসপত্র কিছু পড়ে রইল বটে গেরস্তর বাড়িতে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়।

ঘুরপথে হেঁটে সে শহরের রাস্তায় উঠে পড়ল। খুবই অন্ধকার আর ঠাণ্ডা রাত। চারদিকে হিম কুয়াশা। গোবিন্দ তার গায়ের কথাটা পর্যন্ত আনেনি। শীতে একেবারে জমে যাচ্ছে। এই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় খুব জোরে জোরে হাঁটা। গোবিন্দ হাঁটতে লাগল।

এতকাল ফাঁসির দড়ির ভয় ছিল। পুলিশের ভয় ছিল। এবার তার সঙ্গে এ আর এক অচেনা বিপদ এসে জুটল। সাতনা, কিন্তু আগুন যে সাতনাই দিয়েছে, তার কোনো মানে নেই।

তবে কে? গোবিন্দকে মেরে তার কী লাভ?

ভাবতে ভাবতে কুলকিনারা পায় না গোবিন্দ। সে বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আজকের আচমকা সব ঘটনায় বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় সবটা বিশ্লেষণ করতে পারছে না।

গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে যখন ভোলা মাঠে পা দেবে গোবিন্দ, তখন হঠাৎ পিছনে শুনল কে যেন দৌড়ে আসছে। তবে এক জোড়া পায়ের আওয়াজ।

গোবিন্দ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা শক্ত হলেও যদি একা হয় তবে গোবিন্দর ভয় নেই। যে-কোনো একজন লোকের সঙ্গে সে

অনায়াসে পাল্লা টানতে পারবে।

কে যেন ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে ডাকল, "রাখালদা! ও রাখালদা?"

গেরস্তর মেজো ছেলে। গোবিন্দ চাপা স্বরে বলল, "এখানে।"

কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে জিজ্ঞেস করল, "পালাচ্ছ কেন?"

"না পালিয়ে উপায় নেই। তোমাদের বাড়িতে কি আগুনটা ছড়িয়েছে।

'না। গাঁয়ের লোকেরা বড় বড় বাঁশ দিয়ে গাদার আগুন প্রায় ঠাণ্ডা করে এনেছে। খড়ের আগুন বেশিক্ষণ তো থাকে না।"

"আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম যে। মনে হচ্ছিল, তুমি অত সহজে মরবার পাত্র নও। ঠিক বেঁচে যাবে। তোমাকে লাফ দিয়ে বেগুন খেতে পড়তেও দেখেছি।"

"আর কেউ দেখেনি তো?"

"আমাদের বাড়ির কেউই দেখেনি তবে তুমি পালানোর পর লম্বা আর জোয়ান একটা লোক বেগুনখেতে গিয়ে টর্চ জ্বেলে কী যেন দেখছিল। সে এই গাঁয়ের লোক নয়।"

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাতনা।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে গোবিন্দ?"

"একটা দুঃখী লোক। দুঃখ অনেক সময় মানুষের ভাল করে। কখনো কখনো খারাপও করে। এ-লোকটার খারাপ করেছে।"

"তার মানে?"

"গল্পটা বলার তো সময় নেই। লোকটা কী করল বল।"

“কিছু করল না। খানিকক্ষণ চারদিক দেখে খুব গম্ভীর মুখে একদিকে চলে গেল।”

“সঙ্গে কাউকে দেখলে?”

“কাউকে না।”

“তাহলে ঐ লোকটাও জানে যে, আমি মরিনি!”

“তা জানতে পারে। কিন্তু আগুনটা দিল কে বলো তো। বাবার ধারণা তুমি বিড়ি খেতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছ। সত্যি নাকি?”

ম্লান হেসে গোবিন্দ বলে, “খেলোয়াড়দের বিড়ি সিগারেট খাওয়া বারণ জানো না?”

ছেলেটা অবাক হয়ে বলে, “তুমি খেলোয়াড় নাকি? কিসের। ‘সারকাসের। কিন্তু সে-গল্পও আর একদিন শুনো।”

“বাঃ রে, এসব কথা আমাকে বলোনি কেন? “তুমি ছেলেমানুষ। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি।”

“কিসের বিপদ?”

“এখন বলার সময় নেই।”

গেরার মেজো ছেলে অভিমানভরে বলল, “কিছুই তো আমাকে বলছ। কিন্তু আমি যে তোমাকে খুব ভালবাসতাম।”

গোবিন্দ একটু ভাবল। তারপর বলল, “বেশ কিছুদিন আগে কাশিমের চরে একটা লোক খুন হয়েছিল। তার নাম হরিহর পাড়ুই। জানো?”

“জানি। সারকাসের খেলোয়াড় মাস্টার গোবিন্দর তো সেই জন্যই ফাঁসি হবে।”

"হয়নি। কারণ আমিই গোবিন্দ মাস্টার।"

"তুমি?" বলে যেন ভূত দেখে আঁতকে ওঠে ছেলেটা।

গোবিন্দ তার কাঁধে হাত রেখে বলে, "খুনটা যে আমি করিনি সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে না। তবে হরিহরের সঙ্গে সেই রাতে কাশিমের চরে আমি গিয়েছিলাম বটে।"

"তবে কে খুনটা করল?"

"তা জানি না। কিন্তু জানতেই হবে। যেমন করেই হোক। খুনিকে ধরতে না পারলে পুলিস শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরবেই।"

"তাহলে তুমি পালাও।"

"তাই পালাচ্ছি।"

.

১৭.

উদ্ধববাবু ঠিক করলেন আজকের রাতটা জেগে পাহারা দেবেন। বাড়ির লোকেরা খুব-একটা রাত জাগাতে আগ্রহী নয়। চাকরবাকরেরা দায়ে পড়ে জাগবে বটে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস

নেই! উদ্ধববাবু একাই জাগবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর দুজন সঙ্গী জুটে গলে। একজন তার ছোট ছেলে রামু। বাচ্চাদের রাত জাগা উদ্ধববাবু পছন্দ করেন না বটে, কিন্তু রামুটা বেস ডাকাবুকা আছে, গুলতির হাতটাও বেশ পাকা। লেখাপড়ায় বুদ্ধি না খুললেও অন্যান্য ব্যাপারে যে রামুর বুদ্ধি খুব চটজলদি খেলে তা উদ্ধববাবু জানেন। কাজেই রামু যখন বাবার সঙ্গে পাহারা দেওয়ার প্রস্তাব করল তখন তিনি খুব-একটা

আপত্তি করলেন না। কটমট করে ছেলের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, "ফুলহাতা সোয়েটার পরে, মাথায় কানে বেশ করে কমফর্টার জড়িয়ে নেবে। পায়ে জুতো মোজা থাকে যেন।" দ্বিতীয় সঙ্গী জুটল নবৃহ বছরেরর জাফর মিঞা। বয়স নবৃই হলেও জাফর মিঞার শরীরটি মেদহীন, দীর্ঘ এবং খুবই কর্মক্ষম। তিনি সামান্য দুধ আর ফল ছাড়া অন্য কোনো খাবার খান না। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়েন। তাঁর মাথাটি ঠাণ্ডা, মেজাজটি ঠাণ্ডা, মুখে সর্বদা হাসি। তবে জাফর মিয়া কানে কম শোনেন। উদ্ধববাবুকে সেই ছোট অবস্থা থেকে দেখে আসছেন। সেই উদ্ধববাবুর বাড়িতে ডাকাত পড়বে শুনে তিনি নিজেই যেচে একটা লাঠি হাতে চলে এলেন। গাল কান মাথা ঢাকা বাঁদুরে টুপি, মোটা কম্বল আর নাগরা জুতোয় তাকে বেশ জম্পেশ দেখাচ্ছিল।

উদ্ধববাবু নিজেও সঙ্গে একটা অস্ত্র রাখলেন। বহুকাল আগে তার এক রাজপুত মক্কেল মামলায় জিতে একটা তরোয়াল উপহার দিয়েছিল। বংশের স্মৃতিচিহ্ন। তরোয়ালটা বেশ লম্বা আর ভারী। রাজপুত বলেছিল, এই তলোয়ার যদি খোপ থেকে কখনো বের করেন তবে রক্ত না খাইয়ে খাপে ভরবেন না। আজ পর্যন্ত এই তলোয়র রক্ত না খেয়ে খাপে ঢোকেনি কখনো। এমনি রক্ত না জোটে তো কুকুর-বেড়াল পোকামাকড় যা হোক একটা মেরে নিয়মটা রাখবেন।

উদ্ধববাবু রক্ত খাওয়ানোর কথা শুনে তরোয়ালটা কখনও খাপ থেকে বের করেননি। আজ করলেন। দেখে অবাক হলেন, দশ বছর খাপের মধ্যে একটানা বন্ধ থেকেও তলোয়ারটার গায়ে একটু মরচে পড়েনি। এখনো ঝকঝক

করছে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, অস্ত্রটা হাতে নিলেই শরীরের রক্ত কেমন একটু চনমন করে ওঠে। ঘোড়ার পিঠে চেপে এক্ষুনি যুদ্ধযাত্রায় পড়তে ইচ্ছে করে।

কিন্তু উদ্ধববাবুর ঘোড়া নেই। ধারেকাছে কোথাও কোনো যুদ্ধও হচ্ছে না। তাই তিনি শূন্যে কয়েকবার তলোয়ারটাকে ঘুরপাক খাইয়ে নিলেন। মনে দুর্জয় সাহস এল।

রাত এগারোটার পর তিনজন বাইরের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসলেন। ফ্লাক্সে চা, টিফিন ক্যারিয়ারে লুচি আর আলুর দম। তিনটে নতুন ব্যাটারি ভরা টর্চ।

জাফর মিঞা বললেন, "পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখলে পারতে হে উদ্ধব। বদমাশগুলো যদি দেল বেঁধে আসে তাহলে আমরা তিনজন কী করব?"

উদ্ধববাবু বলেন, "সেটা একবার ভেবেছিলাম। তবে একটা পাখির জন্য পুলিশ পাহার বসালে লোকে আমাকে পাগল ভাববে। তাই অতটা আর করিনি! এমনিতেই আজ আদালতে আমার সম্পর্কে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হাকিম।"

ভালমানুষ জাফর মিএ কী বুঝলেন কে জানে। শুধু বললেন, " ভাল। ভাল।"

রাত বারোটার মধ্যেই জাফর মিঞা ঢুলতে লাগলেন। রামু প্রথম দিকটায় তেজে পাহারা দিচ্ছিল। কিন্তু বাচ্চা ছেলে, হঠাৎ কোন সময়ে শতরঞ্চিতে কোণ ঘেঁষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। উদ্ধববাবু একা।

তবে একা হলেও ভয়ের লেশমাত্র তিনি টের পাচ্ছেন না। হাতের তরোয়ালটা ঝকঝক করছে। শরীরের রক্ত এতই গরম হয়ে উঠেছে যে এই শীতেও তার ঘাম হতে লাগল। তিনি প্রথমে আলোয়ানটা খুললেন, তারপর সোয়েটার ছেড়ে ফেললেন। তাতেও গরম বোধ করায় গায়ের জামাটা খুলে সেটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগলেন। গায়ের গেঞ্জিটাও ভিজে গেছে ঘামে। সেটাও খুলবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় থানার ঘড়িতে একটা বাজবার ঢং শব্দ হল। উদ্ধববাবু তরোয়াল-হাতে পায়চারি করতে করতে দরবারি কানাড়া রাগের একটি মুড তৈরি করতে লাগলেন। ভারী গভীর এবং গম্ভীর রাগ। তার গলায় রাগটা খোলেও ভাল। গাইতে গাইতে বেশ আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। পাখির কথা মনে রইল না, পাহারার কথা মনে রইল না। সুরের ওঠা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের তরোয়ালটাও উঠছিল নামছিল। পা পড়ছিল লেতালে। চোখ বোজা। উদ্ধববাবু স্পষ্টই টের পাচ্ছিলেন, আজ র গলায় অন্য কেউ ভর করেছে। এ যেন তার সেই পুরানো গলাই নয়।

সুরের এক মায়ারাজ্য থেকে রাগরাগিণীর বাতাস ভেসে আসছে। চারদিকে এক সুরের সম্মোহন ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন চোখ মেললেন তখন তিনি ঠিক বাস্তবজগতে নেই। নিজের সুরের রেশ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বেশ অনেকটা সময় গেল ধাতস্থ হতে। তখন অবাক হয়ে দেখেন, রামু উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। জাফর মিএ ঘন-ঘন চোখের জল মুছছেন। বারান্দায়, সামনের বাগানে, ডাইনে বাঁয়ে বিস্তর পাড়া প্রতিবেশী জড়ো হয়েছে। প্রত্যেকেই হাঁ করে দেখছে তাকে।

উদ্ধববাবু একটু লজ্জা পেলেন। গান তিনি ভালই গেয়ে থাকেন বটে, কিন্তু এত রাতে লোক জড়ো হওয়ার মতো ততটা কি? যাই হোক, তিনি হাতজোড় করে শ্রোতাদের নমস্কার জানালেন।

ঠিক এই সময়ে বেরসিক গবা পাগল বলে উঠল, "আপনি তো গানের ঠেলায় পাড়া জাগালেন। ওদিকে যে হয়ে গেছে।"

উদ্ধববাবু মিটিমিটি হেসে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করেন, "কী হল রে আবার?"

"আবার কী?" যেনাদের আসবার কথা ছিল তেনারা এসে কাজ হাসিল করে হাওয়া।

উদ্ধববাবুর মাথাটা আজ বড় ভাল। এই শীতের রাতে গান গেয়ে তিনি সকলের ঘুম ভাঙিয়েছেন। তার সুরের চুম্বকে সকলে ছুটে এসেছে। এই সাফল্যের পর তার এলেবেলে কথা ভাল লাগছে না। তবু গলাটা মিষ্টি রেখেই বললেন, "আরো লোক এসেছিল বুঝি? তা বসতে দিলি না কেন?"

"তারা বসবার জন্য এলে তো বসতে বলব! তারা কাজ গুছোতে এসেছিল, কাজ গুছিয়ে সরে পড়েছে।

তাই নাকি?" উদ্ধববাবু তবু গা করেন না।

গবা পাগলা বলল, "আমিও গোয়ালঘরের চালে বসে পাহারা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি আপনি তরোয়াল ঘুরিয়ে গান ধরেছেন। তরোয়ালের ডগাটা একবার রামুর পেটের ধার ঘেষে গেল, আবার জাফরচাচার নাকের ডগা ছুঁয়ে এল। মারাত্মক কাণ্ড। ভাবছি নেমে এসে আপনাকে জাপটে ধরি। ঠিক এই সময়ে নোরা এলেন। পাঁচ-সাতজন তাগড়া জোয়ান। আপনি চোখ বুজে গানে মত্ত।"

তারা আপনার চোখের সুমুখ দিয়ে, বগলতলা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল যন্ত্র দিয়ে, তারপর চোখের পলকে পাখির দাঁড়টা নিয়ে আপনার সুমুখে দিয়েই বেরিয়ে গেল। গান যে কী সর্বনেশে তা আজ বুঝলাম।

উদ্ধববাবু এখনো সঙ্গীতের সুরলোক থেকে নেমে আসতে পারেননি। চোখে এখনো ঘোর। মিষ্টি করে বললেন, "পাখি নিয়ে গেছে? যাক। পাখি যাক, সুর তো ধরা দিয়েছে। তুই বরং রাঘব ঘোষকে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।"

লোকজনের ভিড় ঠেলে হঠাৎ দারোগা কুন্দকুসুম বারান্দায় উঠে এলেন। মুখ গম্ভীর। বললেন, "উদ্ধববাবু, আপনার মতো বিশিষ্ট লোককে হ্যাঁরাস করতে চাই না। কিন্তু আপনার পাড়া প্রতিবেশীদের কয়েকজন গিয়ে আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে আপনি গভীর রাতে বিকট চিৎকার করে তাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন। ইন ফ্যাক্ট, আমিও থানা থেকে একটা চেঁচানি শুনতে পেয়েছি। প্রতিবেশীরা আপনাকে থামানোর জন্য এসে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু আপনি একটি বিপজ্জনক অস্ত্র ঘোরাচ্ছেন দেখে তারা কেউ কাছে আসতে ভরসা পাননি। তাদের ধারণা, আপনি পাগল হয়ে গেছেন। আপনার বিরুদ্ধে বিপজ্জনক অস্ত্র রাখা ও ব্যবহার এবং লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর দু-দফা অভিযোগ। আমি আপনাকে গ্রেফতারও করতে পারি। কিন্তু অতটা না-করে আজ কেবল একটা ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে আর এরকম করবেন না।"

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর উদ্ধববাবু সুরলোক থেকে দড়াম করে বাব জগতে নেমে এলেন। কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাখিটা তবে নিয়ে গেছে?"

গবা বলল, "তবে আর বলছি কী?"

উদ্ধববাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, "তবে চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল, তুই কিছু করলি না?"

গবাও সমান তেজে বলে, "সে তো আপনারও চোখের সামনেই নিয়ে গেছে। আমাকে দোষ দিচ্ছেন শুধু-শুধু। আমি একা অতজনের সঙ্গে পারব কেন?"

"চেঁচাতে তো পারতিস!"

গবা হেসে বলে, "আজ্ঞে, আপনার গানের চোটে আর সব শব্দ তো লোপাট হয়ে গিয়েছিল আমার চেঁচানি শুনবে কে? তবু চেঁচিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার গলার দাপটে আমার চেঁচানি ঢাকা পড়ে গেল।"

জাফর মিঞা হঠাৎ একগাল হেসে বললেন, "উদ্ধব আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি। বুঝলে! হঠাৎ কানের ভিতরকার ঝিঝি ভাবটা কেটে গেছে।"

উদ্ধববাবু কটমট করে তাকিয়ে বলেলেন, "তাই নাকি?"

ওঃ তোমার গান যে কী উপকারী তা আর বলার নয়। প্রথমটায় একটু আঁতকে উঠেছিলাম বটে। কিন্তু তার পর থেকেই কান ভেসে যাচ্ছে হাজার রকম শব্দে।

" বলে উদ্ধববাবু তবোয়াল-হাতে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন। রক্ত না-খাইয়ে তরোয়াল খাপে ভরা বারণ। উদ্ধববাবু তরোয়ালটার দিকে চেয়ে বললেন "খাওয়াচ্ছি রক্ত। নে খা।"

বলে তরোয়ালটা দিয়ে নিজের কণ্ঠনালী চেপে ধরলেন।

.

১৮.

ভোর রাত্রে সামন্তমশাইয়ের তাঁবুতে একটা লোক ঢুকল। চাপা গলায় ডাকল, "সামন্তমশাই!"

সামন্ত ঘুম পাতলা। এক ডাকেই জেগে লক্ষ্যটা উসকে দিয়ে বলে "কে?"

"আমি গোবিন্দ। শুনলাম সারকাস এখান থেকে চলে যাচ্ছে।"

সামন্ত একটা শ্বাস ফেলে বলে, "রাত ভোর হলেই গোছগাছ শুরু হবে। বেলাবেলিই রওনা হওয়ার কথা।"

"আমি কি পড়ে থাকব এখানে? আমাকেও সঙ্গে নিন।"

সামন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তোকে না নেওয়া কি আমার ইচ্ছে? কিন্তু পুলিশ কড়া নজর রাখছে। যেখানে যাব সেখানেও রাখবে। লুকিয়ে থাকতে তো পারবি না।"

"তাহলে?"

"তাহলে যে কী তা আমার মাথায় খেলছে না। রোজই তোর কথা ভাবি। কিন্তু কোনো ফন্দিফিকির খুঁজে পাচ্ছি না! "

"সারকাস ছাড়া যে আমি বাঁচব না।" বলে গোবিন্দ সামন্তর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। তার চোখে জল।

সামন্ত তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, "কী যে গেরোয় পড়েছিস বাবা। ভগবান তোকে কেন এমন বিপদে ফেলল তাও বুঝি না। ভাল লোকেরাই দেখছি এই দুনিয়ায় সবচেয়ে হতভাগ্য।"

গোবিন্দ মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদল। তারপর মুখ তুলে বলল, "আপনি আমার বাবার মতো আপনাকেই তাই বলতে বাধা নেই। আমি ভাল লোক নই সামন্তমশাই।

সামন্ত চোখ বড়-বড় করে বলে, "তোকে আমি এইটুকু বয়েস থেকে জানি। বলতে কি আমার কাছেই প্রতিপালিত হয়েছিস। কোনোদিন চুরিটুরি করিস নি, মিথ্যে কথা বলিস নি, লোকে বিপদে পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহায্য করেছিস, তবু তুই ভাল লোক নোস, এ আবার কেমন কথা?"

গোবিন্দ চোখের জল মুছে বলে, "সে-সব আপনিই শিখিয়েছেন। ভাল লোকের কাছে থাকলে লোকে সৎ শিক্ষাই পায়। কিন্তু কয়লা ধুলে কি ময়লা যায়? আমার ভিতরে যে গরল ছিল।"

"সে আবার কী কথা?"

গোবিন্দ ধীর গম্ভীর গলায় বলে, "হরিহরকে আমি খুন করি নি বটে, কিন্তু আমার মনে পাপ ছিল। গুপ্তধনটা খুঁজে পেলে আমার ইচ্ছে ছিল, হরিহরকে খুন করে সবটুকু আমি হাতিয়ে নেব। তারপর সেই টাকায় নিজের একটা সারকাসের দল খুলব। "

"বটে।" সামন্ত একটু বিষমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি, আমি মরলে এই সারকাস তোরই হবে। আমি জানি, তোর মাথায় ব্যবসা করে টাকা রোজগারের মতলব নেই। সারকাস একটা আনন্দের জিনিস। লোকের কাছ থেকে পয়সা আমরা নিই বটে কিন্তু সেটাই কথা নয়। বড় কথা হল, ছোট-ঘোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে সাহস আর আনন্দ জাগিয়ে তোলা আর নিজেরাও তা থেকে আনন্দ পাওয়া। লোভ থাকলে ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায় না, ভাল মানুষ হওয়া যায় না। তার হঠাৎ লোভ এল কোথা থেকে?"

"লোভটা বাইরে থেকে আসে না, সামন্তমশাই। লোভ মানুষের ভিতরেই থাকে।" গোবিন্দের চোখে আবার জল। চোখ মুছে সে বলল, "হরিহরকে খুন করার কথা ভেবেছিলাম দুটো কারণে। একে তো হরিহরের মতো বদমাশ দুটো নেই। আর একটা কারণ হল, আমি ওকে খুন না করলে ও-ই আমাকে খুন করত।"

সামন্ত চোখ ছোট করে খুব একদৃষ্টে গোবিন্দর দিকে চেয়ে ছিল। বলল "তোর সঙ্গে হরিহরের চেনা-পরিচয় হল কী করে?"

"হরিহরকে সবাই চিনত। আমরা যখন কাশিমের চরের কাছে খেলা দেখছিলাম তখন একদিন হরিহর আমার কাছে লুকিয়ে আসে। আমাকে বলল, সে এক জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। আমি যদি সেই গুপ্তধন উদ্ধারে তাকে সাহায্য করি তাহলে সে আমাকে অর্ধেক বখরা দেবে। গুপ্তধনের কথা শুনেই প্রথম আমার ভিতরে লোভ জেগে উঠল।"

"সন্ধান পেয়েছিলি?"

"না। গুপ্তধনটা ছিল এক বুড়ির। সে সম্পর্কে হরিহরের পিসি হয়। সেই বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই? এমন-কী সেই গুপ্তধনও নাকি বুড়ি চোখে দেখে নি। তবে সন্ধানটা সে-ই জানত। বুড়ি একটা কাকাতুয়া পুষত, আর সেটাকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসত। গোপনে নাকি বুড়ি কাকাতুয়াটাকে সেই গুপ্তধনের সন্ধান শিখিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আর কাউকে বলত না। হরিহর বুড়ির গুপ্তধনের সন্ধান জানার জন্য বিশু নামে নিজের এক সাকরেদকে পিসির বাড়িতে চাকরের কাজ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বিশুও কোনো সন্ধান রে, করতে পারে নি। তবে একদিন বিশু কাকাতুয়াটাকে চুরি করে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে হরিহর বিশুর পিছু ধাওয়া করে এক মাঠের মধ্যে তাকে খুন করে। কিন্তু বিশু খুন হওয়ার আগে পাখিটার পায়ের শিক্‌লি খুলে উড়িয়ে। দেয়। ওদিকে হরিহরের পিসি কাকাতুয়ার শোকে মারা যায়। তবে মরার আগে সে যখন ভুল বকছিল তখন হরিহর সেইসব কথা থেকে গুপ্তধনের জায়গাটা আঁচ করে ছিল। কিন্তু তা উদ্ধার করা বড় সহজ কাজ ছিল না। তাই আমার কাছে এসেছিল হরিহর।"

“তারপর কী হল?”

“সে অনেক ঘটনা। কাশিমের চরে একটা মস্ত পুরনো বাড়ি আছে। সেই বাড়ির অনেকগুলো গম্বুজ আছে। কোনো গম্বুজেই উঠবার কোন সিঁড়ি নেই। আর এমন সমান করে তৈরি যে কোন খাজ-টাজও নেই যা বেয়ে ওঠা যায়। হরিহর বলেছিল তার মধ্যে একটা গম্বুজের মাথায় নাকি একটা ঢাকনা নীচে গভীর এক কুয়োর মুখ। গম্বুজের মাথা থেকে সেই কুয়ো নেমে একেবারে মাটির তলায় চলে গেছে। আর মাটির তলায় কোনো কুঠুরীতে আছে সেই গুপ্তধন। সেই কুঠুরিতে পৌঁছানো খুব শক্ত কাজ। সারকাসের খেলোয়াড় ছাড়া সে-কাজ করার সাধ্য খুব কম লোকের আছে।”

“তুই হরিহরের কথায় রাজি হলি?

“প্রথমে হইনি। পরে লোভ হল। ভীষণ লোভ। মনে হল, রাতারাতি বড়লোক হওয়ার এমন সুযোগ আর পাব না।”

“তা বলে খুনের কথা ভাববি?”

“লোভ একটা নেশার মতো সামন্তমশাই, যখন ঘাড়ে চাপে তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না।”

“তারপর কী হল?”

“কথা ছিল, আমি সন্ধেবেলা সেই পোড়ো বাড়িতে হাজির থাকব। হরিহর আসবে। কিন্তু সে সময়তো এল না। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই বাড়িতে বহু গম্বুজ। কোটা যে গুপ্তধনের সুড়ঙ্গ তা তো জানি না। হরিহর এসে চিনিয়ে দেবে। কিন্তু সে আর হল না। কাশিমের চরে অন্য একদল বদমাশের হাতে হরিহর খুন হয়ে গেল সেই রাতে। আমার চোখের সামনেই ঘটনা। দোষের মধ্যে আমি গিয়ে হরিহরের লাশটাকে নাড়াচাড়া

করেছিলাম, বেঁচে আছে কিনা দেখতে। যদি তার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা। যায়। ঠিক সেই সময়ে কিছু লোক এসে পড়ল সেখানে। ধরা পড়ে গেলাম।”

“তুই বলেছিলি, জেলখানা থেকে তোকে পালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেটা কেন দেওয়া হল তা জানিস?”

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, “একটু-একটু বুঝতে পারি। জেলখানায় পুরনো এক ডাকাতির দাগি আসামী আছে। এখন সে ওয়ার্ডেন। কথায় কথায় তাকে একদিন গুপ্তধনের গল্পটা বলেছিলাম। মনে হয় লোকটা সেই থেকে লোভের খপ্পরে পড়ে গেছে। আমার ফাঁসি হলে তো সে আর গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তাকে আমি জায়গাটার নাম বলতেও রাজী হই নি। কাজেই সেপাইদের। সঙ্গে বন্দোবস্ত করে সে সে আমাকে পালানোর পথ করে দিয়েছিল। সে তো জানে পালিয়ে গিয়ে আমি সেই গুপ্তধনের সন্ধান করবই। গুপ্তধন উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাকড়াও করা হবে। শুনেছি সেই দাগি আসামীর দলটা এখনো বেশ দাপটে ডাকাতি করে বেড়ায়, আর সে জেলে থেকেও তাদের সর্দার।

.

১৯.

গলায় তরোয়ালের ধারালো দিকটা চেপে ধরে উদ্ধববাবু চোখ বুজে দুর্গানাম স্মরণ করে বিড়বিড় করে বললেন, “দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মাগো! সন্তানকে কোলে তুলে নাও মা। দেখো, যেন বেশি ব্যথা-ট্যথা না পাই, রক্তপাত যেন বেশি না হয়। মরার পর যেন ভূত-টুত হয়ে থাকতে না হয়। সব দেখো মা!” বলতে বলতে তরোয়ালটায় একটু চাপ দিয়েছে।

আত্মহত্যার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে চিন্তা করতে করতেই উদ্ধববাবু শোওয়ার ঘরে ঢুকেছিলেন। তরোয়ালটা হাতেই ছিল। রক্ত না খাইয়ে সেটাকে খাপে ভরা বারণ। সুতরাং তিনি চটপট স্থির করে ফেললেন, এক কাজে দুই কাজ সেরে ফেলাই ভাল।

"কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল "বাবামশাই, লুচি খাব।"

উদ্ধববাবু চোখ খুললেন। অবাক হয়ে দেখলেন, উত্তর দিকের জানালার গরাদ দিয়ে কাকাতুয়াটা সেঁধিয়ে ঘরে ঢুকছে। টালুক-টুলুক করে দেখছে তাকে। চোখে চোখ পড়তেই বলল "সব ভাল যার শেষ ভাল।"

উদ্ধববাবু তরোয়াল রেখে দিয়ে কাকাতুয়াটাকে বুকে তুলে নিয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। ধরা গলায় বললেন, "তোর জন্যেই এ-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম বাপ, কত লুচি খেতে চাস? তোকে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াব।" বলে ভিতর-বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁক দিলেন, "ওরে নয়নকাজল, শিগগির লুচির জন্য ময়দা মাখ।"

কিন্তু নয়নকাজল তখন ময়দা মাখার মতো অবস্থায় তো আর নেই। বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সে মাটির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর দানবের মতো একখানা পা রেখে দাঁড়িয়ে সাতনা। গলায় বল্লমটা চেপে ধরে সাতনা বলছে, "প্রাণে বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল।"

ভয়ে নয়নকাজল বাক্যিহারা হয়ে গেছে। দোষটা, অবশ্য তারই। পরশুদিনই একটা লোক তার মামাতো ভাই সেজে এসে তাকে দুশো টাকা দিয়ে বলে গেছে, "আমরা ঠিক সময়মতো আসব। উদ্ধব বাধা দেবে দিক। তুই পাছ দুয়ার দিয়ে পাখিটা বের করে দিবি।" নয়নকাজল সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পাখি গুপ্তধনের সন্ধান জানে। এমন পাখি হাতছাড়া করার জন্য মাত্র দুশো টাকায় রফা করে কোন আহাম্মক! সে পাপষ্টি বলে দিল "ওসব হবে না। আমাকে ভাগ দিতে হবে। পাখি নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।"

সেই কথাই ঠিক ছিল। ডাকাতরা বাড়ি ঢুকতেই নয়নকাজলও পাখিটাকে দাঁড় থেকে খুলে র‍্যাপারে চাপা দিয়ে পাছ-দুয়ার খুলে বেরোয়। তারপর সবাই মিলে হাঁটা দিয়েছে জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কাকাতুয়া খুব ছোটখাটো পাখি তো নয়? বেশ বড়সড়, আর ওজনও অনেকটা। জঙ্গলের কাছ-বরাবর এ-বগল থেকে ও-বগলে নেওয়ার সময় পাখিটা হঠাৎ ঝাঁপটা মেরে উড়ে গেল।

নয়নকাজল সাতনার দিকে চেয়ে চি-চি করে বলল, "মাকালীর দিব্যি বলছি, হাতটায় ঝি-ঝি ধরেছিল বলে, ইচ্ছে করে ছাড়িনি।"

দলের ষণ্ডামতো আর-একটা লোক সাতনাকে ডেকে বলল, "এক্ষুনি মারিস। ওটাকে দিয়ে কাজ হবে।"

সেই লোকটা এসে সাতনাকে সরিয়ে নয়নকাজলকে টেনে দাঁড় করাল। তারপর দু-গালে ফটাস ফটাস করে দুখানা চড় মেরে বলল, "আবার যা। এবার শুধু পাখি নয়, উঁকিলের ছোট ছেলেটাকেও চুরি করবি। উকিলটা মহা উঁদড় আছে। থানা-পুলিশ করতে পারে। ছেলেটা আমাদের হাতে থাকলে তা আর করতে সাহস পাবে না।" চড় খেয়ে নয়নকাজলের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করছিল। সে কোনো মতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সাতনা তার গলায় বল্লমটা আবার ধরে বলল, "শোন্ বাপু, গুপ্তধনের ভাগ চাস সে অনেক বড় কথা। কিন্তু এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ঠিক ঠিক কাজ করিস। একটু গুবলেট হলে যমদোরে গিয়েও আমাদের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। মনে থাকবে?"

নয়নকাজল মাথা নাড়ল। একটু দম নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

বাড়ি পৌঁছুতে ফর্সা হয়ে গেল চারদিক। উদ্ধববাবুর হুংকারে পাড়া কঁপছে। "কোথায় গেল সেই পাজি ছুঁচোটা? সেই তখন থেকে কাকাতুয়া লুচি লুচি করে হেদিয়ে মরছে!"

নয়নকাজল হাঁফাতে হাঁফাতে উদ্ধববাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "আজ্ঞে বাবামশাই, ধরতে ধরতেও ধরতে পারলাম না। একটুর জন্য…. "

উদ্ধববাবু নয়নকাজলের উড়োখুড়ো চেহারা দেখে আঁতকে উঠে বললেন, "কাকে ধরতে পারলি না?"

'দলে পাঁচ জন ছিল। হাতে ঈয়া বড় দা, বন্দুক, কুড়ুল, বল্লম। তা ভাবলাম, যার নুন খাই তার জন্য না হয় প্রাণটা দেব। পাখিটা চুরি করে যেই না তারা পালাচ্ছে। আমিও লাঠি নিয়ে পিছু ধরলাম। মাইলটাক পর্যন্ত দৌড়ে ধরেও ফেলেছিলাম প্রায়। কিন্তু ভয় খেয়ে তারা এমন ছুটতে লাগল যে, একটুর জন্য..... "

উদ্ধববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুঁ! ঠিক আছে, এখন গিয়ে দু'সের ময়দা মাখ ভাল করে। ডাকাতদের ব্যবস্থা আমি করছি।"

নয়নকাজল উদ্ধববাবুর কাঁধে বসা পাখিটার দিকে কটমট করে একবার চেয়ে ময়দা মাখতে গেল।

.

২০.

গতকাল রাতে কাকাতুয়াকে চুরি করতে ডাকাত এসেছিল কিন্তু চুরি করতে পারেনি। সকালে কাকাতুয়াকে লুচি খাইয়ে উদ্ধববাবু থানায় গেলেন। এতকাল এ-ব্যাপারে পুলিশকে জড়াননি তিনি। কিন্তু রাত্তিরে যা হয়ে গেল তাতে তিনি ভাবনায় পড়েছেন। ডাকাতদলকে ঠেকানো তো একার কাজ নয়।

উদ্ধববাবু উকিল হিসেবে খুবই ডাকসাইটে। সবাই তাকে খাতিরও করে। কুন্দকুসুমও করতেন। কিন্তু রাত্রির ঘটনার পর আজ যেন উদ্ধববাবুকে তিনি বিশেষ পাত্তা দিতে চাইছিলেন না। ঘটনাটা শুনে বরং হোঃ হোঃ করে খানিক হেসে বললেন, "একটা পাখির জন্য সাতটা ডাকাত কাল আপনার বাড়ি চড়াও হয়েছিল, এ-কথা নিতান্ত আহাম্মক ছাড়া কে বিশ্বাস করবে বলুন!"

উদ্ধববাবুও জানেন, পাখির জন্য ডাকাতি হয় এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে। কিন্তু তাঁর পাখিটা যে গুপ্তধনের সন্ধান জানে এ-কথাটাও তিনি ফাস করতে চান না। গলাখাঁকারি দিয়ে তিনি বললেন, "পাখিটা আসলে খুব দামি। রেয়ার টাইপের জিনিস।"

কুন্দকুসুম ভ্রূ কুঁচকে উদ্ধববাবুকে একটু দেখে নিয়ে ফিচেল হাসি হেসে বললেন, "একটা খুব রেয়ার পাখিরও দাম নিশ্চয়ই এত বেশি হতে পারে

যার জন্য বাড়িতে ডাকাত পড়বে। আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ পেলেন উদ্ধববাবু?"

কথাটা যুক্তিযুক্তই। কিন্তু কুন্দকুসুম তো আর গোপন কথাটা জানেন না। উদ্ধববাবু তাই মাথা চুলকে বললেন, "সে যাই হোক, আমার বড় ভয় করছে। আজ রাত থেকে আমার বাড়িতে দুজন আর্মড গার্ড যদি রাখেন তবে বড় ভাল হয়।"

কুন্দকুসুম মাথা নেড়ে বললেন, "অসম্ভব। আমার হাতে যে ফোর্স আছে তা নিতান্তই সামান্য। তার ওপর এই থানার সব জায়গায় রিসেন্টলি ক্রাইম ভীষণ বেড়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট একজন ফেরারি খুনি আসামীর জন্য আমাকে সদর থেকে এক্সট্রা ফোর্স আনতে হচ্ছে। আপনি যত বড় উকিলই হোন উদ্ধববাবু, এই অবস্থায় আপনার পোষা পাখিকে পাহারা দেওয়ার জন্য লোক দিতে পারব না। মাপ করবেন!"

উদ্ধববাবু মরিয়া হয়ে বললেন, "ডাকাত যে পড়েছিল তার কিন্তু সাক্ষী আছে। তারা দরকার হলে আদালতে বলবে যে, আপনি আমার বিপদ জেনেও প্রোটেকশন দেননি।"

"বটে!" বলে কুন্দকুসুম সোজা হয়ে বসে কটমট করে উদ্ধববাবুর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনি আমার বিরুদ্ধে আদালতে যাবেন বলে ভাবছেন। কারা সাক্ষী আছে বলুন তো! আমি তাদের স্টেটমেন্ট নেব।"

"গবা আছে, আমার ছোট ছেলে রামু আছে, জাফরচাচা আছে।"

কুন্দকুসুম বাজখাই গলায় আবার হাঃ হাঃ করে হাসলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "রামু বা জাফরচাচা সাক্ষ্য দেবে না। ওরা কিছু দেখেনি। বরং সাক্ষ্য দিলে ওরা উলেটো কথাই বলবে। এরা বলবে যে, আপনি বিপজ্জনক এক অস্ত্র নিয়ে বহু লোকের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন, বিকট চিৎকার করে লোকের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন।"

"ওরা দেখেননি!" চিন্তিত উদ্ধববাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "কিন্তু গবা তো দেখেছে।"

"গবাকে সাক্ষী দাঁড় করালে দেশসুদ্ধ লোকের কাছে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। কারণ সবাই জানে গবা বদ্ধ উন্মাদ। পাগলের সাক্ষ্য টেকে না, উকিল হয়ে এটা আপনার জানা উচিত ছিল।"

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন।

কুন্দকুসুম পিছন থেকে তিক্তমধুর গলায় বললেন, "সকালে আপনি রটিয়েছিলেন যে, আপনার পাখিটা চুরি গেছে বা ডাকাতি হয়েছে। কিন্তু আমি খবর রাখি যে, পাখিটা এখনো আপনার কাছেই আছে।"

উদ্ধববাবু কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু শেষ অবধি বললেন না। বলে লাভও নেই। এই মাথামোটা লোকটা তাকে বিশ্বাস করবে না। আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি থানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

পাখিটার জন্য আজ রাতে ডাকাতরা আর একবার হানা দিতে পারে। সুতরাং সন্ধের আগেই উদ্ধববাবু তৈরি হতে লাগলেন। তবে অসুবিধে দেখা দিল লোকজন জোটানোর বেলায়। জাফরচাচাকে বলতে গিয়েছিলেন উদ্ধববাবু, "চাচা, আজও আমার সঙ্গে রাতটা গল্পগুজব করে কাটাবেন নাকি?"

জাফর মিঞা আঁতকে উঠে বললেন, "কানে শোনার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি ভাই, সেটা আবার হারাতে চাই না। তাছাড়া আজ বাতের ব্যাথাটাও চাগাড় দিয়েছে।" ||||||||| উদ্ধববাবু রামুকে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না। এমন কি নয়নকাজলকে পর্যন্ত ডেকে গলা ভেঙে ফেললেন। "কোথায় যে সব থাকে!" বিরক্ত হয়ে এই কথা বলে সন্ধেরাত্রিতেই উদ্ধববাবু বন্দুক কাঁধে নিয়ে বাড়ির চারদিকটা টহল দিলেন। টর্চ জ্বেলে বাড়ি সবচেয়ে দুর্বল অংশ কোটা এবং কোথা দিয়ে ডাকাতরা বাড়িতে ঢুকতে পারে তা ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলেন। বাড়িটা তার খুবই মজবুত এবং নিরাপদ। কিন্তু তা বলে কি আর রন্ধ্র থাকতে পারে না! লখিন্দরের বাসরঘরেও তো র ছিল।

ওদিকে তার স্ত্রী এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও বাড়ির চারদিকে সার্চ করতে লেগে গেছে।

উদ্ধববাবু খিড়কির দরজাটা পেরেক দিয়ে একেবারে সেঁটে দিলেন, তারপর কয়েকটা পাথরের চাই এনে ঠেকা দিলেন তাতে। বাড়ির চারদিকে উঁচু পাঁচিলের

ওপর উঠে কাঁটাতার বিছিয়ে দিলেন। আর সামনের বারান্দায় সরষের তেল ঢাললেন। অনেকগুলো কলার খোসা ছড়িয়ে রাখলেন। ডাকাতরা হুড়মুড় করে এলে যাতে আছাড় খায়। কেলেহাঁড়ি দিয়ে একটা কাকতাড়ুয়াও বানালেন। সেটাকে সামনের দরজার পাশে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

সবই হল, কিন্তু নয়নকাজলের পাত্তা নেই। সে নাকি বিকেলের দিকে দোকানের সওদা করতে গেছে। এখনো ফেরেনি। রামু গেছে খেলার মাঠে। তারও কোনো পাত্তা নেই। উদ্ধববাবু বেশ উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত। কী করবেন ভেবে না পেয়ে তিনি স্টোর রুমে তালা দিয়ে রাখা পাখিটাকে দেখতে গেলেন।

তালা খুলে তার চোখ কপালে উঠল। দাঁড় ফাঁকা। পাখির পালকটিরও পাত্তা নেই।

পাখি-রামু-নয়নকাজল! দুয়ে দুয়ে চার করতে উদ্ধববাবুর দেরি হল। অবশ্য পাখির দাঁড়ে একটা চিরকুটও লটকানো ছিল। তাতে লেখা-"পাখিটা বিধিসম্মত মালিকের হস্তগত

হইয়াছে। ব্যাপারটি লইয়া শোরগোল করিলে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের প্রাণ সংশয় হইবে। জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।”

কিন্তু তবু শোরগোল হল। পাড়া প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে ছুটে এল। কিন্তু তাতেও দেখা দিল প্রবল গণ্ডগোল। বারান্দায় আর উঠোনে ধপাধপ লোজন আছাড় খাচ্ছে আর “বাবা রে, মা রে, গেছি রে” বলে চেঁচাচ্ছে। খুন্তিবুড়ি চোখে কম দেখেন। তিনি সামনের দরজায় কাকতাড়ুয়াটাকে দেখে ভূত ভেবে সেই যে ভিরমি খেলেন আর চোখ খোলার নামটি নেই। সামনের বারান্দায় ভিড় হওয়ায় জনাকয় লোক পাঁচিলে উঠেছিল। কাঁটাতারে জামা কাপড় আটকে তাদের বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। রামুর মা আর ঠাকুমা ডুকরে কাঁদতে লেগেছে, রামুর ভাইবোনেরা কাঁদছে। এই গোলমালে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়। বারবার সবাইকে চুপ করতে বললেন উদ্ধববাবু। কে শোনে কার কথা! অবশেষে এই গোলমালে অসহ্য হয়ে উদ্ধববাবু বন্দুকটা আকাশে তাক করে দুম দুম করে দুটো ফায়ার করলেন। তাতে ফল হল উলটো। যারা কঁদছিল তারা আরো জোরে কাঁদতে লাগল। পাড়াপড়শির বাচ্চারা ভয় খেয়ে চেঁচাতে লাগল। বন্দুকের শব্দে যারা চমকে উঠে পালাবার ভাল করেছিল তারা ফের কলার খোসা আর তেল-হড়হড়ে মেঝেয় আছড়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। তবে উপকার হল একজনের। ভিরমি কেটে উঠে পড়লেন খুন্তিবুড়ি।

কিছুক্ষণ বাদে লোকজন বিদেয় হল, কুন্দকুসুম তদন্তে এলেন। চারদিক ঘুরেটুরে দেখে বললেন, “আপনার বন্দুকের লাইসেনস আছে তো?”

“আছে।” উদ্ধববাবু বুক চিতিয়ে বললেন।

কুন্দকুসুম বুক ফুলিয়ে বললেন, “থাকলেই কী! যখন-তখন ফায়ার করার আইন কিন্তু নেই। যাকগে, আপনার মন আজ অস্থির, বন্দুকের ব্যাপারে তাই কিছু বলছি না। আর রামুকে কিডন্যাপ, পাখিটা চুরি এবং নয়নকাজলের উধাও হওয়া-এগুলো আমার নোট করা রইল।”

কুন্দকুসুম চলে যাওয়ার পর বেশ একটু রাতের দিকে গবা পাগলা এসে ঢুকল। তার মুখ থমথমে।

উদ্ধববাবু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ভাবছেন। হাতে এখনো বন্দুক। ডাকাতরা শোরগোল করতে নিষেধ করেছিল, কিন্তু শোরগোল কিছু বেশিই হয়ে গেছে। এখন রামুর কী হয় সেইটে নিয়েই তাঁর চিন্তা।

গবা ডাকল, "বাবু।"

"কী বলছিস?"

"একজন কাজের লোক রাখবেন? খুব ভাল লোক।"

এই দুঃসময়ে পাগলটা চাকর রাখার প্রস্তাব নিয়ে এসেছে দেখে উদ্ধব অবাক হন। বলেন, "কী বলছিস?"

গবা তখন উদ্ধবের কানে-কানে চুপি-চুপি কটা কথা বলল।

২১-২৫. রামু নিরুদ্দেশ

রামু নিরুদ্দেশ, কাকাতুয়া বেহাত, নয়নকাজল হাওয়া। বাড়িতে প্রচণ্ড ডামাডোল। এরই মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে একটা নতুন কাজের লোক বহাল হয়ে গেল।

উদ্ধববাবুর প্রেশার বেড়ে গেছে, তিনি শয্যা নিয়েছে। ডাক্তার এসে দেখে নড়াচড়া বারণ করে গেছেন। কিন্তু উদ্ধববাবু কেবল এপাশ-ওপাশ করেন। তাঁর ছোট ছেলেটা দুষ্ট ছিল বটে, তিনি শাসনও করতেন তাকে, কিন্তু এখন তার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। ছেলেটাকে কি ওরা জ্যান্ত রাখবে?

রাত বেশ গম্ভীর হয়েছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। উদ্ধববাবু ঘুমোনোর বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে উঠে বসে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন। কিঠ সেই সময়ে ভিতরবাড়ির দিককার দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। উদ্ধববাবু হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

ঘরে ঢুকল নতুন কাজের লোকটা।

“কী চাও” উদ্ধববাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“আজ্ঞে আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।”

“এত রাতে কথা কিসের?”

“আজ্ঞে টের পাচ্ছি রামুর চিন্তায় আপনার ঘুম হচ্ছে না। শরীরও ভাল যাচ্ছে না আপনার। তাই বলতে এসেছিলাম গুপ্তধনের হদিস যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ ওরা রামুর ক্ষতি করবে না। তাতে ওদের লাভ নেই।”

“কিন্তু হদিস পেতে আর বাকি কী? কাকাতুয়া তো ওদের হাতে।”

"তা বটে। কিন্তু মজা হল, কাকাতুয়াকে ঠিক-প্রশ্নটি না করা গেলে সে কিছুতেই হদিস বলবে না। এই কাকাতুয়াটাকে নিয়ে আমি বহুকাল ধরে চিন্তা করেছি। হরিহর পাড়ুই পারেনি, বিশু পারেনি, আপনারাও পারেননি। অনেক ভেবে দেখেছি, পাখিটাকে ঠিক প্রশ্নটি যতক্ষণ করা না হচ্ছে, ততক্ষণ তার মুখ থেকে আসল কথাটি বেরোবে না।"

"প্রশ্নটা তুমি জানো?"

"আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু যারা পাখিটা চুরি করেছে তাদের মাথা অত সাফ নয়। পাখির কাছ থেকে তারা কথা বের করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। যা করার আমি আর গবাদা মিলে করব?"

"গবা বলছিল, তুমি নাকি সারকাসের খেলোয়াড়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কথাটা পাঁচকান করবেন না।"

উদ্ধববাবু চোখ বুজে বলেন, "সব বড় গোলমাল ঠেকছে হে। এক সারকাসের খেলোয়াড় বাড়ির চাকর হয়ে ঢুকল। বাড়ির পুরনো চাকর ডাকাতের দলে গিয়ে ভিড়ল। ছেলেটা গুম হয়ে গেল। সব বড় গোলমাল ঠেকছে।"

নতুন লোকটা মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে তা আর বলতে। তবে কিনা আমি লোক খারাপ নই।"

"তা কে জানে বাপু। আমার আর কাউকে বিশ্বাস হয় না। তবু তুমি যখন বলছ তখন একটু নির্ভর করেই দেখি।"

"আমি বলি কি বাবু, আপনি বরং শুয়ে শুয়ে দরবারি কানাড়ার সুরটা গুনগুন করতে থাকুন। ঘুমের সবচেয়ে বড় ওষুধ হল গান।"

উদ্ধববাবু কটমট করে লোকটার দিকে চাইলেন। ভাল করে দেখে তার মনে হল লোকটা ঠাট্টা করছে না। তখন খুশি হয়ে বললেন, "আমার গানের কথা তোমায় কে বলল?"

"কেউ বলেনি। ভাল গাইয়ের গলা কথাবার্তায়ও ফুটে ওঠে। কালে খাঁ সাহেব যখন চাকরকে বকতেন বা রান্নার নিন্দে করতেন, তখনো সমঝদার লোক 'কেয়াবাত, কেয়াবাত' করে উঠত। তাছাড়া বড় গাইয়ের বাড়ির গোরু কুকুর কি পোষা পাখির গলায় পর্যন্ত সুর এসে যায়। আপনার নেড়ি কুকুরটার গলায় আজ সন্ধেবেলাতেই আমি একটা সাপটা শুনেছি।"

"বলো কী?" উদ্ধববাবু খুবই অবাক ও উত্তেজিত হল।

লোকটা বিনয়ে হেসে হাত কচলে বলল, "সুর এমনই জিনিস যে, চেপে রাখা যায় না। যার গলায় সুর আছে, সে শত চেষ্টা করেও কোনোদিন বেসুর বের করতে পারবে না গলা থেকে। আপনার যেমন, একটু আগে শুয়ে শুয়ে ' আঃ উঃ করছিলেন, আমি দরজার বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। শুনলাম তার মধ্যেও সুর আছে।"

উদ্ধববাবু এত দুঃখেও হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, "সমঝদারই নেই হে দেশে, সমঝদার থাকলে কি আজ আমাকে ওকালতি করে খেতে হত? তা তুমি আমার বাড়িতেই থেকে যাও। সারকাসের সমান মাইনে দেব। কাজকর্ম কিছুই করতে হবে না। শুধু আমার একটু সেবা-টেবা করবে আর কি।"

"সে হবে'খন বাবু। এখন আমি বিদেয় হই। অনেক কাজ বাকি।"

উদ্ধববাবু শুয়ে পড়লেন। সিলিং-এর দিকে চেয়ে খুব সাবধানে গলা ঝেড়ে নিয়ে আবার উঠে বসলেন। বাঁ হাতে কান চেপে ধরে নিখুত দরবারির সুর ধরলেন। তারপর আর বাইরের শোক-দুঃখ তাকে স্পর্শ করল না।

নতুন চাকরটা নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর মৃদু একটা শিস দিল সে। অন্ধকারে আর একটা মূর্তি এগিয়ে এল কাছে। তার দুহাতে ধরা দুটো সাইকেল। দুজনে সাইকেলে চেপে এত জোরে ছুটতে লাগল যে, মোটরগাড়িও পাল্লা দিতে পারবে না।

প্রায় ত্রিশ মাইল রাস্তা একনাগাড়ের সাইকেল চালিয়ে দুজনে যখন কাশিমের চরের কাছাকাছি পৌঁছল তখন এই দুর্দান্ত শীতের রাতেও তারা ঘেমে নেয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্রামের সময় নেই। সামনেই একটা জঙ্গল। মরা নদীর খাত। তারপর আবার জঙ্গল।

ঘন ঝোঁপঝাড়ে মধ্যে সাইকেল লুকিয়ে রেখে দুজনে এবার পায়ে হেঁটে চলতে লাগল। দুজনের মধ্যেই চমৎকার বোঝাঁপড়া। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কিছু জিজ্ঞেস করছে না। যেন আগে থেকে প্ল্যান করা আছে এই অভিযান।

দ্বিতীয় জঙ্গলটায় খানিকদূর ঢুকে দুজনে থামল। জিরোতে নয়। অন্ধকার কুয়াশামাখা এই রাতে চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। দুজনে তাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রাতের শব্দগুলিকে চিনবার চেষ্টা করল। কোন্ শব্দটা প্রাকৃতিক, কোষ্টা নয়। সন্দেহজনক কিছুই অবশ্য শুনতে পেল না তারা। তবে এরপর সাবধানে এগোতে লাগল।

সামনেই একটা দুর্গের মতো মস্ত বাড়ির কালো ভুতুড়ে আকারটা জেগে উঠছিল কুয়াশার মধ্যেও। একটা জায়গায় সামনের জন থামল। তারপর আস্তে ডাকল, "গবাদা।"

"হুঁ।"

"এই হল সেই জায়গা, যেখানে হরিহর খুন হয়। মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"আর সামনে ঐ সেই বাড়ি।"

"জানি।" দুজনে চুপ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। এবার গবা ডাকল, "গোবিন্দ।"

“বলো।”

“হরিহরকে খুন হতে আমি দেখেছি। তবে খুনিকে দেখিনি। আর দেখিনি

বলেই সাক্ষ্যও দিইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। সাক্ষ্য দিলে তুই নির্দোষ মানুষ হয়তো খালাস পেসি।”

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, “না, গবাদা। খালাস হলেও ওরা আমাকে ছাড়ত না। জেলখানাতেও ওদের লোক আছে। বিরাট দল। ফাঁসিতে না ঝুললেও খুন হতাম।”

দুজনে বাতাসের মতো ফিসফিস করে কথা বলছিল। এত আস্তে যে, চার হাত দূর থেকেও শোনা যায় না।

গবা আর গোবিন্দ আর একটু এগিয়ে গেল। তারপর গোবিন্দ বলল, “গবাদা, এইবার।”

গবা গলাটা সাফ করে নিল একটু। তারপর হঠাৎ বেশ চেঁচিয়ে গান ধরল, আজ মনটা করে উড়ন খুড়ন গা করে আইঢাই। কাশিমের চবে দেখি জনমানব নাই। আছে শুধু বিজ্ঞপক্ষী আর যতেক ভক্তজন। ইংগিতে কয় কথা পাখি, তা বুঝেছেন কজন। আয় রে যত নন্দীভৃঙ্গী, তোদের ডাকে হরিহর। পাখির পেটে কথা করে খচরমচর। আছে গুরু আছে জ্ঞান কিন্তু শিষ্য নাই। বিজ্ঞপক্ষী গোমড়া মুখে বসে থাকেন তাই।

গান শেষ হলে দুজনে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। অনেকক্ষণ কেটে যায়।

গোবিন্দ বলে, “ওরা বোধহয় এদিকে আসেনি গবাদা।”

গবা হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল তোলে।

কাছে-পিঠে জঙ্গলের মধ্যে সড়সড় শব্দ হয় একটু। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে বা কারা আসছে।

.

২২.

দুজনে নিঃসাড়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে। টের পাচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ নজর করছে তাদের দিকে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও একদম সামনে কেউই এগিয়ে এল না।

“গবাদা।”

গোবিন্দ ফিসফিস করে বলল। “বলে ফ্যাল।”

“ওরা আমাদের মাপজোখ করছে। কাছে আসছে না।”

“তাই তো দেখছি। কিন্তু এই কুয়াসা আর অন্ধকারে মাপজোখটা কীভাবে?”

“সেও তো কথা। আর আমরাই বা উজবুকের মতো লুকিয়ে আছি কেন? ওরা যে খুঁজে পাবে না আমাদের।” বলে গোবিন্দ উঠতে যাচ্ছিল।

গবা হাতটা টেনে ধরে বলল, “দূর পাগল। অতটা বেপরোয়া হোসনে। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?”

“তুমি গানটা তাহলে আর একবার ধরো! ওরা জবাব দেয় কিনা।”

গবা গলা খাকারি দিয়ে গান ধরল, “দানাপানি খায় রে পক্ষী, উড়াল দিতে চায়। তার শিকল করে ঠিনিন বেন্ধে রাখা দায়। এইবার উড়িলে পক্ষী আর না পাবে তারে। ধনরত্নের হদিস রবে চির অন্ধকারে। তাই শুন শুন বুদ্ধিমন্ত যতেক ভক্তজন। পাখিরে কওয়াতে কথা এসেছেন দুজন। অতি শিষ্ট ভদ্র নখদন্ত নাই। দুধুভাতু খাই মোরা ধর্মেরে ডরাই।”

“গবাদা।” এবার বেশ একটু হেঁকেই ডাকল গোবিন্দ।

“বলে ফ্যাল।”

“কই, কারো তো টিকি দেখছি না।”

“এখনো বোধহয় মাপজোখ করছে।”

“দাঁড়াও। ওদিকে এক বাঁশঝাড়ের কাছে একটা ছায়া মতো দেখছি। বলে উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসে একটা মৃদু শিসের মত শব্দ হল। অন্ধকারেও ঝিকিয়ে উঠল একটা বিদ্যগতি বল্লম।

“বাপ রে!” বলে গোবিন্দ বসে পড়ল।

বল্লমটা খচ করে বসে গেল পিছনের একটা গাছে।

“জোর বেঁচে গেছিস।” গবা গোবিন্দকে কাটাঝোঁপ থেকে টেনে তুলতে তুলতে বলে।

“অন্ধকারেও নিশানা দেখেছ? এই টিপ যার-তার হাতের নয়।”

“বকবক করিসনি। এখন চল, উঠে লম্বা দিই।”

গোবিন্দও কথাটায় সায় দিয়ে বলল, “তাই চলো। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করল না কেন বলো তো?”

“সেটাই বুদ্ধির কাজ।”

দুজনে জঙ্গলের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসতে থাকে।

জঙ্গলের বাইরে এসে গবা একটু হাঁপ ছেড়ে বলে “আর যাহোক, হোক, আমাদের গান ওদের কানে তো পৌঁছেছে। যদি কাজ হয় তো ওতেই হবে।”

“আমরা কারা তা জানবে কী করে?”

“খোঁজ নেবে। জানা কিছু শক্ত না। একটু বুদ্ধি চাই। সেটা ওদের ভালই আছে।”

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে গোবিন্দ জিজ্ঞেস করে, “কিন্তু সাতনার দল আমাকে খড়ের গাদায় পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল কেন বলো তো!”

“সে আর বলা শক্ত কী? তোকে মারলে হরিহরের সত্যিকারের খুনি বেঁচে যাবে। তুই যে নির্দোষ তা আর প্রমাণ হবে না।”

“আমাকে হাতে পেলে কি ওরা মেরে ফেলবে গবাদা?”

“চেষ্টা তো করবেই।” গোবিন্দ আর কিছু বলল না।

গবা বলল, “রামুটার কথা ভাবছি। কীভাবে রেখেছে ওকে কে জানে! উদ্ধববাবুকে শাসিয়ে গেছে, পাখিচুরির কথা পাঁচকান হলে রামুকে জ্যান্ত রাখবে না। তা সে-কথা তো দুনিয়া-সুষ্ঠু লোক জেনে গেছে।

এ-কথায় গোবিন্দ থমকে দাঁড়িয়ে গবার হাত চেপে ধরে বলল, “গবাদা, ফিরে যাই চলে। আমরা দুজন হলেও দশজনের মহড়া নিতে পারি। চলো গিয়ে ওদের ডেরা হুটোপাট করে দিয়ে রামুকে নিয়ে আসি।

গবা মাথা নেড়ে একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, “উদ্ধববাবু রামুকে খুব শাসন করে বটে, কিন্তু আমি জানি, ওই দুষ্টু ছেলেটাই ওঁর সবচেয়ে প্রিয়পুত্র। যদি কোন খারাপ খবর পান তাহলে আর বাঁচবেন না।”

“তাহলে?”

“তাহলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা চাই। সব কাজেই যে বুক চিতিয়ে বোকা-সাহস দেখাতে হবে তার কোন মানে নেই। উঁচ হয়ে ঢুকবি, বোমা হয়ে বেরোবি।”

"ঢুকতে দিচ্ছে কোথায়! যা একখানা বল্লম ঝেড়েছিল আজ।"

"রোস না দুদিন। পাখির মুখ থেকে তো আর আসল কথাটি বেরোচ্ছে!"

কাশিমের চর নিঃঝুম। হাড় কাঁপানো শীতে কুয়াশায় কম্বল জড়িয়ে গোটা জায়গাটাই ঘুমিয়ে আছে যেন। মাঝে-মাঝে শেয়ালের ডাক আর পাছার ভুতুড়ে শব্দ ওঠে ঝোপেঝাড়ে। রাতপাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ-হঠাৎ। বাঁশবনে ঝিঝির ঝিনঝিন। কিন্তু এইসব শব্দ যেন কাশিমের চরের নির্জনতাকেই আরো গাড় করে তোলে।

দোতলার একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে মেঝের ওপর চটের বিছানায় রামু শুয়ে আছে। গায়ে একটা কুটকুটে কম্বল, এরকম শুয়ে তার অভ্যাস নেই। মেঝে থেকে চট ভেদ করে পাথুরে ঠাণ্ডা আসছে। কুটকুটে কম্বল দিয়ে ঢুকছে বাইরের শীত। বারবার তাই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রামুর। দুষ্টুমি করতে গিয়ে বহুবার বহুরকম বিপদে পড়েছে। দুষ্টু ছেলেরা পড়েই। কিন্তু এরকম বিপদে সে কোনো কালে পড়েনি।

ডাকাতদের এই দলটা বেশ বড়সড়। চেহারাগুলো একদম ভদ্রলোকের মতো নয়। হাতে সবসময়ে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি, বন্দুক-টকও আছে। কারো কোনো মায়া দয়া নেই। খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ এসে খবর দিল, "তোমার বাবাকে কারা যেন পূর্বলির মাঠে মারধোর করে ফেলে রেখে গেছে। শিগগির এসো।"

খবরটা পেয়েই রামু লোকটার পিছু-পিছু ছুটল। কদিন আগেই উদ্ধববাবুকে আদালত থেকে ফেরার পথে কারা বোমা মেরেছিল। এই সেদিনও বাড়িতে

ডাকাত পড়েছে। সুতরাং লোকটার কথায় রামুর অবিশ্বাস হয়নি। উদ্ধববাবুকে ওরা মারতেও পারে।

পূর্বস্থলির মাঠ শহরের বাইরে। ভারী নির্জন জায়গা। সাঁঝের আবছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। রামু সেখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকানোরও সময় পেল না। শিমুল গাছের পেছন

থেকে জনাচারেক লোক বেরিয়ে এসে একটা গামছায় তার মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর একটা গোরুর গাড়িতে তুলে ফেলল চটপট। অনেক রাতে তারা এসে পৌঁছায় এই জায়গায়। রামু পরে তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছে এই জায়গারই নাম কাশিমের চর।

প্রথম রাত্রিটা সারাক্ষণ বাড়ির কথা ভেবে কেঁদেছে রামু। এরা রুটি আর একটা আলুর ঝোল খেতে দিয়েছিল। তা ছোঁয়নি সে। কিন্তু সকাল থেকে রামুর চোখের জল শুকিয়ে গেল। একটা দৈত্যের মতো লম্বা-চওড়া লোক এসে তাকে প্রথমেই বলল, "শোনো রামু, তোমার এই দশা। উদ্ধব-উকিল। বোকাও বটে, জেদিও বটে। কিন্তু সে জানে না, আমার সঙ্গে বিবাদ করলে তাকে নির্বংশ হতে হবে। সে-কাজ শুরু হবে তোমাকে দিয়েই। একটু যদি বেচাল দেখি তবে রামদা দিয়ে দুখানা করে কেটে ফেলব। এখন যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিকঠাক জবাব দাও। প্রথমে বলল, গবা পাগলা আসলে কে!"

রামু ভয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে বলল, "গবাদা তো পাগল।"

"ওর পাগলামিটা চালাকি ছাড়া কিছুই নয়। সেটা আমরা জানি। কিন্তু ওর আসল পরিচয়টা আমাদের দরকার।"

"গবাদা কারো কোন ক্ষতি করে না তো।"

"ক্ষতি যাতে করতে না পারে তার জন্য সাবধান হওয়া ভাল।"

"গবাদার আর কোনো পরিচয় আমি জানি না।"

লোকটা অবশ্য রামুকে এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করেনি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার লোকটা এল। কিন্তু তার সঙ্গে নয়নকাজলকে দেখে রামু হাঁ। সে চেঁচিয়ে উঠল, "নয়নদা।" কিন্তু সঙ্গের লোকটা রামুকে একটি ধমক মেরে বলল, "চাপ!" রামু ভয়ে চুপ করে গেল!

নয়নকাজলও রামুর দিকে ভাল করে চাইতে পারছিল না। অন্য দিকে চেয়ে রইল। তার হাতে রামুদের কাকাতুয়ার দাঁড়টা।

দৈত্য লোকটা বলল, "এই পাখিটা কিছু গোপন খবর জানে। কিন্তু কিছুতেই বলছে না। তোমাদের পোষা পাখি, তোমরা নিশ্চয়ই এর গোপন কথা জানো!"

রামু মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। পাখিটা গুপ্তধনের কথা বলে বটে, কিন্তু কোথায় তা আছে তা কখনো বলেনি।"

লোকটা বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তোমার কাজ হল পাখিটার পেট থেকে কথা বের করা। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। যদি তার মধ্যে পারো ভাল,

যদি না পারো তবে পাঁচ ঘা করে বেত খাবে রোজ। এই নয়নকাজলও থাকবে পাশের ঘরে। সে নজর রাখবে তুমি কী করছ না-করছ।"

রামু আর নিজেকে সামলাতে না-পেরে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "নয়নদা! তুমিও এদের দলে?"

নয়নকাজল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

.

২৩.

ঘুম বারবার ভাঙছে রামুর। বড় শী; বিছানাটাও বড় শক্ত, তেইশ।

কম্বল কুটকুট করছে। জেগে উঠলে সে জঙ্গলের গভীর নিস্তব্ধতা টের পায় আর গা ছমছম করে ওঠে তার। যে-বাড়িটায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, সেটা বিশাল। তবে প্রায় সবটাই ভেঙে পড়ে গেছে। এখানে-সেখানে এক-আধটা ঘর দাঁড়িয়ে আছে কোনক্রমে। বাদবাকিটা হঁট আর চুন-সুরকির ভূপ। ডাকাতরা যথাসম্ভব বাড়িটাকে নিজেদের থাকার

মতো করে নিয়েছে। তবে রামু জানে এটা ওদের স্থায়ী আড়ডা নয়। একসঙ্গে বেশি লোক এখানে থাকে না। প্রায় সব সময়েই আনাগোনা করে। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। সে-দরজাও পেল্লায় ভারী কাঠের। ঘরখানাও খুবই বড়-সড়। মেঝেয় আর দেওয়ালে পঙ্কের কাজ করা। তবে সবই অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মেঝেয় ফাটল, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। দিনের বেলা ঘরটা খুব ভাল করে দেখে নিয়েছে রামু। পালানোর কোন পথ নেই। আর পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? চারদিকে জঙ্গল। ডাকাতরা চারদিকে নজর রাখছে। ঘুম ভেঙে অন্ধকারে চুপচাপ তাকিয়ে ছিল রামু। শীতে একটু থরথরানি উঠছে শরীরে। কম্বলটা ভাল করে মুড়ি দিয়েও শীত যাচ্ছে না।

হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হল। খুব মৃদু টোকা দেওয়ার মতো শব্দ। রামু কান খাড়া করল। না, ভুল নয়। আবার গোটা দুটি টোকা পড়ল।

স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই রামু বুঝল, এই টোকা ডাকাতদের নয়। অন্য কারও কোনো কাণ্ড। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। কম্বল মুড়ি দিয়ে দরজার কাছটায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে রইল সে চুপচাপ। খানিকক্ষণ বাদে একটু জোরে টোকা দেওয়ার শব্দ। কে যেন চাপা গলায় ডাকল, “রাম!”

গলাটা চিনল রামু। বিশ্বাসঘাতক নয়নদা। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হলেও এই শত্রুপুরীতে নয়নকাজলই তার একমাত্র চেনা লোক। এমনিতে একসময়ে নয়নদা রামুকে ভালও বাসত খুব। পেয়ারার ডাল দিয়ে গুলতি বানিয়ে দিয়েছে, চাবি পটকা বানাতে শিখিয়েছে, তার টাইফয়েডের সময় এই নয়নকাজলই লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে সন্দেশ এনে খাইয়েছে।

রামু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে দরজার কাছে মুখ নিয়ে বলল, “কে, নয়নদা?”

“হ্যাঁ। পাহারাদারটা একটু তফাতে গেছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ফাঁকে এলাম।”

“কী চাও?”

“শোনো, এই দরজায় বাঁ দিকের পাল্লায় একটা ফোকর আছে। এমনিতে বোঝা যায় না। হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজলে একটা ছোট্ট আলপিনের ডগার মতো জিনিস পাবে। সেটা টানলেই গোলমতো একটা ঢাকনা খোলা যায়।”

“তা দিয়ে বেরোতে পারব?”

“না। বেরোনোর কথা এখন ভেবো না। এরা অত কঁচা ছেলে নয়।”

“তাহলে ফোকর দিয়ে কী হবে?”

“তোমার জন্য এক গেলাস দুধ এনেছি।”

“তুমি তো জানোই দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না।”

“সে জানি। কিন্তু এদের দেওয়া খাবার যে তোমার মুখে রুচছে না, তাও তো দেখছি। এরকম আধপেটা খেয়ে থাকলে দুর্বল হয়ে পড়বে যে। আর ও ট্যালটেলে দুধ নয়। একদম ক্ষীরকরা দুধ, সরে ভর্তি।”

রামু দরজা হাতড়ে ফোকরটা খুলতে পারল। নয়নদার দেওয়া দুধটা হাত বাড়িয়ে নিল। মুখে দিয়ে দেখল সত্যিই চমৎকার ক্ষীরের গন্ধ। পুরু সর।

“কী, ভাল?”

“ভাল কিন্তু তুমি তো এদের দলে। তবে আমার জন্য ভাবছ কেন?”

নয়নকাজল একটু চুপ করে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “কপালের ফের রে ভাই। লোভে পড়ে এদের দলে ভিড়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি প্রাণসংশয়।”

“তার মানে?”

"মানে এরা আমাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না। তোমার মতো আমাকে ঘরে আটকে রাখেনি বটে, কিন্তু এদের চোখে ধুলো দিয়ে পালানোরও উপায় নেই। সব গাঁয়ে-গঞ্জে এদের লোক আছে। যেখানে যাব, সেখানেই গিয়ে খুন করে আসবে।"

রামু বলল, "এরা কি মাফিয়াদের মতো?"

"কে জানে বাপু কাঁদের মতো। তবে বিরাট দল। শুনেছি জেলখানাতেও নাকি এদের চর আছে। এদের কোনো লোককে পুলিশ ধরলে সে তিনদিনের মধ্যে জেল ভেঙে পালিয়ে আসে।"

"কিন্তু তোমাকে খুন করবে কেন?"

"সেইই তো হয়েছে মুশকিল। একবার এদের দলে ভিড়লে তার আর ছাড়ান-কাটান নেই। তাকে আর এরা কিছুতেই ফিরে যেতে দেয় না। সে ছিল একরকম। কিন্তু ওদিকে আমাকে ডাকাত বলেও স্বীকার করছে না। কোনো বখরা দেবে না, মাইনে দেবে না, চাকরের মতো খাটাচ্ছে।"

"তা তুমি এখন কী করতে চাও?"

নয়নকাজল করুণ স্বরে বলল, "এ আমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রে ভাই। তাই ভাবছি আমার যা গতি হওয়ার হবে। খামোকা তুমি কষ্ট পাবে কেন? ঠিক করেছি, তোমাকে সুযোগ পেলেই পালানোর পথ করে দেব।"

"পারবে?"

"চেষ্টা তো করব। মুশকিল হয়েছে পাখিটাকে নিয়ে।"

"কী মুশকিল?"

“পাখিটা আসল কথা বলতে চাইছে না। সাতনা তোমাকে বলেছে, পাখিটার পেট থেকে কথা বের করতে না পারলে মেরে ফেলবে। আমি জানি, তুমি ত পারবে না। আর সাতনা সত্যিই তোমাকে খুন করবে।”

“ঐ বিশাল চেহারার লোকটার নাম কি সাতনা?”

“হ্যাঁ। ওর দয়ামায়া বলতে কিছু নেই।”

“ও কি দলের সর্দার?”

“আরে না। দলের সর্দার কে, তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। মক্ত দল, চারদিকে অনেক ডালপালা ছড়ানো।”

“আমার বাবাকে একটা খবর দিতে পারো না নয়নদা?”

“খবর দেওয়ার দরকার নেই। খবর পেলে তোমার বাবা তোমাকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করবেন। তাতে তোমার বিপদ বাড়বে।”

“অন্তত গবাদাকে যদি একটা খবর দিতে পারো।”

“গবা পাগল! সে খবর পেয়ে গেছে। একটু আগে জঙ্গলে একটা লোক গান গাইছিল শুনলে না?”

“না তো!”

“আমি শুনেছি। গবারই গলা। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না। শুধু মনে রেখো, আমি আছি। মরলে মরব, কিন্তু ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ তোমার ক্ষতি হতে দেব না। গেলাসটা দাও, এবার যাই।”

গোলাস নিয়ে নয়নকাজল নিঃশব্দে চলে গেল।

দুধটা খাওয়ার পর শীত একটু কম লাগতে লাগল রামুর। কুটকুটে কম্বল মুড়ি দিয়ে ভরা পেটে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলায় দরজা খুলে প্রথম যে ঘরে ঢুকল সে সাতনা।

ক্ষুরধার চোখে রামুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলল, "কাল রাতে গবা পাগলা এখানে হানা দিয়েছিল, কে তাকে এ-জায়গার হদিস দিল জানো?

"আমি কী করে জানব? রামু অবাক হয়ে বলে।"

"তোমাদের চাকর নয়নকাজলকে কঁটাওলা বেত দিয়ে মার দেওয়া হচ্ছে। এখন। আমাদের মনে হচ্ছে, হদিসটা সে-ই দিয়ে এসেছে।"

রামু একটু কেঁপে উঠল ভয়ে। বলল, "নয়নদা? নয়নদা কী করে খবর দেবে? সেও তো তোমাদের দলে!"

"আমাদের দলে কিনা তা এখনো আমরা জানি না। তোমার বাবার উঁকিলের বুদ্ধি তো কম নয়। হয়তো ওকে চর করে, আমাদের দলে ভিড়িয়েছে। যাকগে, সে-সব ভেবে লাভ হবে না। এখন একটা কথা বলোতো!"

"কী কথা?"

"গোবিন্দ কোথায়?"

"কে গোবিন্দ?"

"গোবিন্দকে তুমি ভালই চেনো সারকাসের গোবিন্দ মাস্টার।"

"সে কোথায়, তা আমি কী করে জানব?"

“আমাদের সন্দেহ, গোবিন্দ তোমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তাকে অন্য কোথাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।”

রামু কঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করে, “তাকে, তোমরা খুঁজছ কেন?”

“তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে আলাদা করা দরকার। তাই খুঁজছি।”

“তুমি এরকম নিষ্ঠুর লোক কেন?

সাতনা কটমট করে রামুর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তারপর হঠাৎ যেন কেমন ছাইমারা হয়ে গেল তার মুখ। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজাটা আঁট করে বন্ধ করে দিল পাহারাদার।

.

২৪.

যুধিষ্ঠিরবাবুর কামাই নেই, রোজ যেমন আসেন তেমনই আজও পড়াতে এসেছেন। কিন্তু যাদের পড়াচ্ছেন তাদের পড়ায় মন নেই। রামুর দুই

দাদা আর তিন দিদির মুখ ভার, চোখ ছলছল গোঁজ হয়ে তারা বসে থাকে।

যুধিষ্ঠিরবাবু আজ বইপত্র খুললেন না, টাস্কও দেখলেন না। রামুর সবচেয়ে বড় দাদা সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, “রামুর কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি, না?”

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, “না আমাদের মা জল পর্যন্ত মুখে তুলছে।, বাবার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে।”

যুধিষ্ঠিরবাবু গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন, “, তা তোমার বাবার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে?”

“হ্যাঁ। বাবা তো ঘরেই শুয়ে আছেন।”

“আমাকে একটু তাঁর কাছে নিয়ে চলো তো!

উদ্ধববাবু আর একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালে উঠেছেন। যন্ত্রের মতো পূজো-আচ্চা সেরে এসে ঘরে শুয়ে পড়েছেন। বুকটা বড় কঁপে আজকাল। মাথায় কত যে চিন্তা!

যুধিষ্ঠিরবাবুকে নিয়ে সোমনাথ ঘরে ঢোকার পর তিনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “বসুন যুধিষ্ঠিরবাবু।”

যুধিষ্ঠির বসে বললেন, “রামুর খবরটা আমি বাইরের লোকের মুখে শুনেছি।”

উদ্ধববাবু কাতর স্বরে বললেন, “হ্যাঁ, বড় পাঁচকান হয়ে গেছে। এখন ভয়, খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে-টেরে ফেলে।”

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, “আপনি পুলিশকে কি সবকথা জানিয়েছেন?”

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “হ্যাঁ কুন্দকুসুম সবই জানে, বিচক্ষণ লোক। কিন্তু সেও তো কিছু করতে পারল না।”

যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, “আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন উদ্ধববাবু, সবাই সবকিছু জানে। কিন্তু কাজের বেলা কেউই কিছু করতে পারছে না।”

উদ্ধববাবু বুক কাঁপিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “করা হয়তো যেত কিন্তু রামুখে আটকে রেখে ওরা আমাদের একেবারে জব্দ করে দিয়েছে। কাল রাতে এসে কুন্দকুসুম বলে গেল কিছু করা সম্ভব নয়। তাহলেই ছেলেটার বিপদ। এই অবস্থায় আমারও মাথায় কিছু খেলছে না।”

যুধিষ্ঠির ভ্রুকুটিকুটিল মুখে বসে রইলেন চুপচাপ। হঠাৎ কুঁজোয় জল নিয়ে বাড়ির চাকরটা ঘরে ঢুকল। যুধিষ্ঠির আনমনে তার দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে ভাল করে তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন

লোকটাকে, খুব লম্বা নয়, মজবুত গড়ন, গালে কিছু দাড়ি। তবু তাঁর স্মৃতি চমকে উঠল। যুধিষ্ঠির সোজা হয়ে বসলেন। উদ্ধববাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বুঝি আপনাদের নতুন কাজের লোক?"

"হ্যাঁ। এই তো তিন দিন হল কাজে লেগেছে।"

যুধিষ্ঠির আর কিছু বললেন না। তবে চাকরটা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন, হুঁ।"

উদ্ধববাবু যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। লোকটা কেমন তা বুঝতে পারছিলেন না। তবে গোপনে শ্রীধরবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। শ্রীধরবাবুর ভাঙা পা এখনো সারেনি। তিনি অবশ্য ভরসা দিয়ে বলেছে, যুধিষ্ঠির সম্পর্কে চিন্তা করবেন না। অতি উত্তম ছেলে। আমি বহুকাল ধরে চিনি।

উদ্ধববাবু অবশ্য নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আজকাল তার সকলেকেই সন্দেহ হয়। তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখের ভাবসাব দেখে সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে চেনেন নাকি?"

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, "না বোধ হয়। চেনা-চেনা লাগছিল বটে, তবে কত মানুষের সঙ্গে কত মানুষের চেহারার মিল থাকে।"

এই বলে যুধিষ্ঠির উঠলেন। বললেন, "রামুর ব্যাপারে আমার যদি কিছু করার থাকে তবে আমাকে বলবেন। শত হলেও সে আমার ছাত্র। বলতে কী আমার অমন উজ্জ্বল বুদ্ধিমান ছেলে কমই দেখেছি।"

"বলেন কী?"

উদ্ধববাবু অবাক হয়ে বলেন, "রামু উজ্জ্বল বুদ্ধিমান?"

"ঠিক তাই। দুষ্টুমির স্টেজটা কেটে গেলেই সেটা বোঝা যাবে।"

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

যুধিষ্ঠিরবাবু সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন। উঠোনের দিকটায় চাকরটা ভেজা কাপড়জামা মেলছে রোদ্দুরে, যুধিষ্টির চাপা স্বরে ডাকলেন, "ওহে, ও গোবিন্দ মাস্টার।"

গোবিন্দ চমকে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল। চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

যুধিষ্ঠির একটু হাসলেন। তারপর কাছে গিয়ে বললেন, "ভয় পেও না। একটু বাইরে নিরিবিলিতে চলো। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

গোবিন্দর চোখের আগুনটা নিভে গেল। বলল, "আজ্ঞে।"

যুধিষ্ঠির গোবিন্দকে নিয়ে বাইরে এলেন। নিরিবিলি বকুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "আমাকে চিনতে পারো?"

গোবন্দ মুখোনা ভাল করে দেখল। তারপর চাপা স্বরে বলল, "চিনি। হরিহর পাড়ুইয়ের ছেলে না তুমি?"

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, "ধরেছ ঠিক। আমার বাবা বড় ভাল লোক ছিল না। পদবীটা আজকাল আর ব্যবহার করি না? এখন আমি যুধিষ্ঠির রায়।"

গোবিন্দ কঠিন স্বরে বলল, "কী চাও? বাপের খুনীকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?"

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, "না। আমার বাবা যেসব পাপ করেছিলেন তাতে তাঁর খুন হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। তার খুনীর ব্যবস্থা সরকার করবে। আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি কোন দলে? কেনই বা এ-বাড়িতে চাকর সেজে আছ?"

গোবিন্দ খুব তীব্র দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরকে দেখছিল। হরিহরের ছেলে লেখাপড়া শিখেছে বলে জানে। হরিহরও বলত তার ছেলে নাকি তার মতো নয়। গোবিন্দ একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, হরিহরকে আমি খুন করিনি।"

"হতে পারে। এখন আসল কথা বলো। তুমি এখানে কী করছ? চাকর সেজে থাকলেই তো ১লবে না। যদি বুঝি তোমার মতলব খারাপ তাহলে উদ্ধববাবুকে তোমার আসল পরিচয়টা আমাকেই দিতে হবে।"

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, "উনি জানেন। আমি রামুর দলে। সাতনার দলে নেই।"

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বললেন, "সাতনা? সে আবার এর মধ্যে আছে নাকি?"

"আছে। দলের সর্দার না হলেও সে বেশ পাণ্ডা গোছের লোক। আমার ধার হরিহরকে সে-ই খুন করেছিল।"

যুধিষ্ঠির একটু আনমনা হয়ে যান। অনেকক্ষণ দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেন, "সাতনা!"

"সাতনাকে আমিও চিনতাম। সে লোক খারাপ ছিল না।"

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে মাথা নেড়ে বলেন, "তার মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর থেকেই সে মানুষ থেকে জানোয়ার হয়ে গেল। তা শোনো গোবিন্দ মাস্টার, যদি সাতনার দলই রামুকে চুরি করে থাকে তাহলে একটা উপায় হয়তো করা যাবে।"

"তার মানে?"

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে বললেন, "সাতনার মেয়েটাকে চুরি করেছিলেন আমার বাবাই। গবার কী মতলব ছিল জানি না। হয়তো সাতনার কাছ থেকে কিছু আদায় করা। কিন্তু চুরি করলেও মেয়েটাকে বাবা মেরে ফেলেননি। আমার এক নিঃসন্তান মাসির কাছে রেখে

এসেছিলেন। যতদূর জানি মেয়েটা এখনো সেখানেই আছে। যত্নে আছে। সাতনাকে বহুবার খবরটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পারিনি।”

“বলো কী!” গোবিন্দর চোখ কপালে উঠল।

“ঠিকই বলছি। তুমি যদি খবরটা সাতনার কাছে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে হয়তো কাজ হবে। বলবে রামুকে ফেরত দিলে সে তার মেয়েকে ফেরত পাবে।”

উত্তেজিত গোবিন্দ কঁপতে কাঁপতে বলল, তোমার মাসির ঠিকানাটা?”

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে বললেন, “ওটা এখন গোপন থাক। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়েটা আছে। আগে খবরটা সাতনার কানে পৌঁছে দাও। তারপর যা করার আমিই করব।”

“তোমার কথা কি সাতনাকে বলব?”

“না বলাই ভাল।” যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, “কারণ যে-গুপ্তধনের জন্য তোমরা সবাই হন্যে হয়ে গেছ তার আসল উত্তরাধিকারী আমিই। কিন্তু আমি ওসব দাবি করব না। আমি চাই গুপ্তধনের উদ্ধার হলে তা সরকারের তহবিলে জমা হোক। সাতনা জানে যে আমিই ওই গুপ্তধনের ওয়ারিশ। কাজেই আমি বেঁচে আছি জানলে সে আমাকে খুন করতে চাইবে।”

গোবিন্দ বলে, “তাহলে কী বলব? সাতনা কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?”

“করবে। মেয়েটার একটা ছবি আমার কাছে। সেটা ওকে দিও। তাহলে বিশ্বাস করবে।”

.

২৫.

পরের রাতেও নয়নকাজল এল। রামু ভেবেছিল, বেত খেয়ে নয়নকাজলের বুঝি হয়ে গেছে। কে দরজায় শব্দ করল। রামু উঠে গিয়ে দরজায় মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

–"আমি নয়নদা।"

"ডঃ নয়নদা! তুমি ভাল আছ?"

"ভাল কি আর থাকি? সারা গায়ে কালশিটে, কঁকালে ব্যাথা, চলতে গেলে মাথা ঘোরে।"

"তোমাকে খুব মেরেছে নয়নদা?"

"খুব। মেরেই ফেলত। কিন্তু পাখিটার মুখ থেকে এখনো কথা বেরোয়নি বলে প্রাণটা আমার রেয়াত করেছে।"

"তুমি পালিয়ে যাচ্ছ না কেন নয়নদা? গিয়ে পুলিশে খবর দাও।"

নয়ন একটু দুঃখের হাসি হেসে বলল, "পালালে যদি বাঁচতুম রে ভাই, তবে, তবে কি আর চেষ্টা করতুম না! আর পুলিশের কথা কি বলব! আমার মতো গরিব-দুঃখী মানুষের কথায় তারা গা করবে না।"

"তাহলে উপায়?"

"উপায় কিছু দেখছি না। যদি নিতান্ত চুনোপুঁটি ভেবে যদি ছেড়ে-টেড়ে দেয়। ভগবান ভরসা। তোমার জন্য আজ আর দুধটুকু আনতে পারিনি।"

"দুধ গবে না। শোনো নয়নদা, এদের সর্দার যখন আবার আমার কাছে আসবে, তখন আমি তাকে বলে দেব যেন আর কখনো তোমার গায়ে হাত দেয়। দিলে আমি পাখির মুখ দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করব না।" নয়ন একটু অবাক হয়ে বলে, "সর্দার! সর্দারকে তুমি কোথায় দেখলে? "কেন ঐ দানবের মতো লোকটা। সাতনা না কী যেন নাম।"

নয়ন একটা শ্বাস ফেলে বলল, "সাতনা সর্দার টর্দার নয়। তবে মোড়ল গোছের একজন বটে। আসল সর্দার যে কে, তা এরা নিজেরাও ভাল জানে। যেই হোক তার অনেক ক্ষমতা। তাকে সবাই যমের মতো ডরায়।"

"তুমি সর্দারকে দেখনি?"

"আমি কেন, এরাও অনেকে দেখেনি। ওসব নিয়ে ভেবো না। সাতনাকে আমার কথা বললে হিতে বিপরীত হবে। এখন ছেড়ে রেখেছে, তুমি কিছু বললে হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে রাখবে।"

"তাহলে বলব না, কিন্তু এই যে তুমি আমার কাছে এসেছ, যদি ধরা পড়ে যাও?"

"সে ভয় খুব একটা নেই। তোমার ওপর এরা তেমন কড়া নজর রাখছে। তুমি ছোট ছেলে, দরজা ভেঙে পালাতে তো পারবে না, আর পালালেই বা যাবে কোথায়? চারদিকে জঙ্গল।"

"এখানে ওরা কজন আছে?"

"বেশি নয়। তবে সব সময়েই তোক আনাগোনা করে। বিরাট কাণ্ড। বিরাট কাণ্ড। কোদাল গাঁইতি দিয়ে চারদিকে খুব খোঁড়াখুঁড়িও হচ্ছে গুপ্তধনের জন্য।"

"কিছু পেয়েছে?"

"না, পাওয়া বড় সহজ নয়।"

"পাখিটা কোথায়?"

"সে খুব ভাল জায়গায় আছে। আমাদের নাগালের বাইরে।"

রামু উত্তেজিত গলায় বলল, "শোনো নয়নদা, আমাদের যেমন করে হোক, পালাতেই হবে। এখানে থাকলে তুমি বা আমি কেউই হয়তো বেঁচে থাকব না।"

"পালাবে? ও বাবা!"

"ভয় পাচ্ছ কেন? মরার চেয়ে তো পালানোই ভাল।"

" ভাল কিন্তু..."

"কিন্তু টিন্তু নয়। ভাল করে দ্যাখো, এ-ঘর থেকে বেরোনোর কোনো উপায় আছে কিনা।"

"দেখেছি। নেই।"

"ছাদে উঠতে পারো?"

"তা পারি।"

"আর-একটা দড়ি লাগবে।"

"তাও জোগাড় হবে। কিন্তু অত সাহস ভাল নয়। শুনেই আমার হাত পা কঁপছে।"

"শোনো নয়নদা, না পালালেও এরা রেহাই দেবে না। আমাকে যদি নাও মারে, তোমাকে মারবে। কারণ তুমি বড় মানুষ, ওদের অনেক গোপন খবর জেনে গেছ। কাজেই তোমার না পালিয়ে উপায় নেই। যদি দুজনে পালাতে পারি, তবে আমি বাবাকে গিয়ে সব বলল। বাবা পুলিশের কাছে। গেলে পুলিশ কিছু না-করে পারবে না। তা ছাড়া গোবিন্দদা আর গবাদা আছে। ওরা ঠিক একটা বুদ্ধি বের করবে।"

নয়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "কিন্তু পালানোর উপায়টা কী ভেবেছ?"

"খুব সোজা। দক্ষিণ দিকে ছাদের কাছে একটা বড় ঘুলঘুলি আছে। অবশ্য অনেক উঁচুতে। ঘুলঘুলিতে পাতলা তারের জাল দেওয়া জালটা পুরনো হয়ে মচকে পড়ে পচে গেছে।

তুমি ছাদে উঠে কার্নিশে ভর দিয়ে ওই ঘুলগুলির ভিতর দিয়ে দড়ি নামিয়ে দেবে। আমি দড়ি ধরে উঠে যাব।”

“পারবে? পড়ে যাবে না তো?”

“না না। আমি গোবিন্দ-মাস্টারের কাছে অনেক মিল নিয়েছি। কিন্তু তুমি খুব সাবধান।”

“আজ রাতেই পালাবে নাকি?”

“আজ, এক্ষুনি। কাল আবার কী হয় কে জানে?”

“আমার বড় ভয় করছে রামু। পুরনো কার্নিশ ভেঙে যদি পড়ে যাই?”

“কার্নিশ যদি পুরনো হয় তাহলে ছাদের রেলিং বা শক্ত কিছুতে দড়িটা বেঁধে নিজে কোমরে জড়িয়ে নিও। পড়বে না কিন্তু সাবধান। শব্দটব্দ কোরো না।”

“আচ্ছা। কিন্তু পারবে তো রামু?”

“আমি পারব। তোমাকেও পারতে হবে।”

“দেখি তাহলে।” মিনমিন করে এ কথা বলে চলে গেল নয়ন।

রামু শীত তাড়ানোর জন্য কয়েকটা ডন-বৈঠক করল। স্কিপিং-এর ভঙ্গিতে নেচে মাংসপেশীর আড় ভেঙে নিল। গা গরম করে না নিলে হঠাৎ কঠিন পরিশ্রম করতে গিয়ে পেশীতে টান ধরে যায়। গোবিন্দদা তাকে অনেক কটা কসরত শিখিয়েছে। সবই ফ্লোর একসাইজ। তার কয়েকটা করে নিল রামু।

তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অন্ধকার ঘরে ঘুলঘুলিটা খুব আবছা দেখা যায়। অনেকটা উঁচুতে। খুব বড় ঘুলঘুলি নয় বটে, তবে রামু গলে যেতে পারবে।

কিন্তু কথা হল, নয়নকাজল পারবে কি না কার্নিশে নামতে। একে ভীতু মানুষ, তার ওপর নয়ন তো আর খেলাধুলো করে না।

ওদিকে নয়ন পড়েছে মুশকিলে। একতলার একটা ঘরে মেলা দড়িদড়া শাবল খন্তা মজুত থাকে। দরজায় তালা-ও নেই। সে নিঃশব্দে গিয়ে একটা দড়ি বের করে এনেছে বটে, কিন্তু বাকি কাজ করতে ডরে ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

দালানের মধ্যে তেমন পাহারা নেই। পাহারা আছে বাড়ির চারধারে। কোনো দরজা বা ফটক দিয়ে বেরোনোর উপায় নেই। আর নীচের তলার দোর দিয়ে অনেক লোক ঘুমোচ্ছে। দোতলাতে গোটা দুই-তিনঘরে লোক আছে। সাড়াশব্দ হলে তারা জেগে যেতে পারে।

নয়ন পা টিপে টিপে ছাদে উঠল। আজও কুয়াশা আছে, শীতও সাংঘাতিক। তবে মাঝরাতে একটু চাঁদের উদয় হয়ে থাকবে। অন্ধকারটা তেমন জমাট নয়। একটু ফিকে ভাব। মস্ত ছাদখানা অনেকটা দেখা যাচ্ছে। বিস্তর আজে বাজে জিনিস, পড়ে আছে ছাদে। পুরনো পিপে, পাথরের মূর্তি, ইট, ভাঙা দরজা-জানালার কাঠ।

নয়ন ঠাহর করে রামুর ঘরটা কোথায় তা আন্দাজ করল। রেলিং দিয়ে ফুঁকতে নীচের দিকে মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল তার। এই এত উঁচু থেকে যদি পড়ে যায় তো মাথাটি আস্ত থাকবে না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে একটু ধাতস্থ হওয়ার চেষ্টা করল সে।

তারপর চোখ খুলতেই বুকের মধ্যে একটা চড়াই পাখি উড়াল দিল যেন।

সামনে তোক দাঁড়িয়ে।

দাঁতে-দাঁতে কত্তাল বাজছিল নয়নের। সে বাবা-গো' বলে ফের চোখ বুজে ফেলল।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কে তুই?"

“আজ্ঞে আমি দলের লোক।”

“এখানে কী করছিস?”

“আজ্ঞে পাহারা দিচ্ছিলাম।”

লোকটা অবাক হয়ে বলল। “ছাদে তো আমার ডিউটি তুই এলি কোত্থেকে? হাতে দড়িই বা কেন?”

নয়ন একটু সাহস করে বলল, “যদি কাউকে ধরে ফেলি তে বাঁধতে হবে না?”

“ওঃ, তাই বল!” বলে হঠাৎ লোকটা হাসতে হাসতেই ঠাস করে একটা চড় কষাল নয়নের গালে। সেই চড়ে চোখে ফুলঝুরি দেখতে লাগল নয়ন। বাপ রে, কী চড়!

২৬-৩০. যখন একটু ধাতস্থ হল নয়নকাজল

যখন একটু ধাতস্থ হল নয়নকাজল, তখন আবার আত্মারামের খাঁচা ছাড়ার উপক্রম। লোকটা তার কণ্ঠার কাছে বল্লমের চোখা ডগাটা ধরে আছে। যা ধার, তাতে একটু চাপ দিলেই গলা এফেঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে। নয়নের বুক ঢিবঢিব করছে, মা কালীর নামটাও স্মরণে আসছে না।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "তোর নাম কী?"

নয়নকাজল জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, "ইয়ে মানে-"

সর্বনাশ! নয়নকাজল দেখে নিজের নামটাও তার মনে নেই মোটেই। মাথাটা এত ঘেবড়ে গেছে যে, কোনও কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে না। বাবার নামও নয়, নিজের নামও নয়, কারো নামই নয়। তবে উপায়?

"কী রে?" বলে লোকটা বল্লমটা একটু নাড়ে। নয়নকাজল চেঁচিয়ে বলে, "আমার নাম লোক।"

"লোক?" বলে লোকটা অবাক হয়ে পড়ে থাকা নয়নকাজলের দিকে চেয়ে বলে, "লোক আবার কারো নাম হয় নাকি?"

"কে জানে বাপু। নিজের নামটা আমার মনে পড়ছে না তেমন। মেলা খোঁচাখুঁচি কোরো না, লেগে যাবে।"

"এখানে কী করিস?"

"ডাকাতি। আর কী করার আছে?"

"তুই কেমনধারা ডাকাত? আমার মতো রোগাপটকা লোকের একটা চড় সহ্য করতে পারিস না। কোন আহাম্মক তোকে দলে ভিড়িয়েছে?"

এ-কথায় নয়নের খুব অপমান বোধ হল। লোকটা তেমন রোগাপটকা মোটেই নয়। দিব্যি ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। হাতের চড়টাও বেশ খোলতাই হয়। নয়ন বলল, "চড়-টড় খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।"

লোকটা হাসল! বলল, "তা দড়ি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলি? গলায় দড়ি দিতে?"

দড়ির কথায় নয়নের গোটা ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তাই তো। রামু যে হাঁ করে বসে আছে তার জন্য। আর তো দেরি করা যায় না।

নিজের অবস্থাটা আড়চোখে একটু দেখে নিল নয়ন। খুবই খারাপ অবস্থা। ছাদের ধুলোবালির মধ্যে চিত হয়ে পড়ে আছে সে। তার বুকের দুদিকে দুখানা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে নোকটা! হাতের বল্লম তার গলায় ঠেকানো। নড়ার সাধ্য নেই।

নয়ন বলল, "তা গলায় দড়ি দিলেই বা কী? তোমার বল্লমের চেয়ে সেটা কতটা খারাপ হবে?"

মতলবটা কী ফেঁদেছিলি সেটা খোলসা করে বল তো বাপ। নইলে গেলি।"

নয়ন লক্ষ্য করছিল, লোকটা তাকে মানুষ বলেই তেমন গ্রাহ্য করছে। ভাবছে নয়নের পিঁপড়ের প্রাণ, তাই ততটা সাবধানও হচ্ছে না। নয়ন নিজের ডান পাটা একটু তুলল। না, লোকটা লক্ষ্য করছে না। পা তোলার ঘটনাটা ঘটছে লোকটার পিছন দিকে। সুতরাং নয়ন লোকটাকে পিছন থেকে একটা রাম লাথি কষাতে পারে। ভয় হল, সেই ধাক্কায় লোকটার বল্লম না আবার তার গলায় বিঁধে যায়। তাই লাথি মারার সঙ্গে-সঙ্গে হাতের ঝটকায় বল্লমটা সরিয়ে নিতে হবে। তারপর মা-কালী ভরসা। নয়ন লোকটাকে অন্যমনস্ক করার জন্য হঠাৎ একটু কঁকিয়ে উঠে বলল, "আমার পেটে বড় ব্যথা। বল্লমটা সরাও।"

লোকটা আবার তার নাটুকে হাসি হেসে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা আর হল না। নয়নের আচমকা লাথিটা লোকটাকে দুহাত ছিটকে দিল। হুড়মুড় করে লোকটা যেই পড়েছে অমনি নয়ন বল্লমটা বাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। খুনটুন সে জীবনে করেনি। তাই বল্লমটা লাঠির মতো বাগিয়ে ইচ্ছেমতো ঘা কতক দিল লোকটাকে। লোকটা নেতিয়ে পড়ে রইল চুপচাপ।

নয়নকাজল দড়ি নিয়ে ছাদের একটা মজবুত রেলিং-এ বেঁধে খানিকটা নিজের কোমরে জড়াল। এখন আর তার আলসে দিয়ে নামতে ভয় করছে। তার চেয়ে বড় ভয় ওই লোকটার যদি চট করে জ্ঞান ফিরে আসে।

দড়ি ধরে একটু ঝুঁকতেই রামুর ঘরের ঘুলঘুলিটা হাতের নাগালে পেয়ে গেল সে। দড়িটা নামিয়ে দিয়ে ডাকল, "রামু!"

"এই যে!"

"উঠে পড়ো তাড়াতাড়ি। বাইরে বিপদ।"

রামু গোবিন্দর কাছে কায়দা-কসরত কিছু কম শেখেনি ক' দিনে। দড়ি ধরে টপ করে ঝুল খেয়ে উঠে এল ঘুলঘুলিতে। তারপর দড়িটা টেনে নিয়ে বাইরের দিকে ঝুলিয়ে নেমে আসতে খুব বেশি সময় লাগল না।

সে যে পালাতে পারে, এটা নিশ্চয়ই কারো মাথায় আসেনি। এলে আরো ভাল পাহারা রাখত। কিন্তু পাহারা নেই। তা বলে পালানোও সহজ নয়। চারদিকে ঘন গাছপালা। নিবিড় জঙ্গল। তারা রাস্তা চেনে না।

'নয়নদা, কোনদিকে যাবে?"

"তাই তো ভাবছি। চলো এগোই যেদিকে হোক। এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়।"

“চলো।” বলে রামু এগাতে থাকে।

কিন্তু এগোনো খুবই শক্ত। শীতকাল বলে সাপের ভয় নেই তেমন। কিন্তু লতাপাতায় পা আটকে যায়। হঠাৎ-হঠাৎ পাখি ডেকে ওঠে।

দুর্গের মতো বিশাল বাড়িটার চৌহদ্দি বড় কমও নয়। খানিকদূর এগোনোর পর সামনে আর-একটা ভাঙা দালান। সেই দালানের একটা ঘর থেকে টেমির আলো আসছে বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে।

নয়ন রামুর হাত চেপে ধরে বলল, “সর্বনাশ! শিগগির অন্য পথে চলো।” রামু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “যাব, একটু উঁকি দিয়ে যাই।”

“পাগল হয়েছ?”

হঠাৎ কাছে-পিঠে একটা ঘোড়া পা দাপিয়ে চিহিহি করে ডেকে উঠল। দুজনেই সেই শব্দে চমকে ওঠে।

“রামু, লক্ষণ ভাল নয়।”

“তুমি চুপ করো তো নয়নদা। অত ঘাবড়ে যাও কেন?”

রামু নিঃসাড়ে গিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। উঁকি মেরে ভিতরে তাকিয়ে তার রক্ত জল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একটা চৌকির ওপর কম্বলের আসনে বিশাল চেহারার এক কাপালিক বসা। তার মস্ত জটাজুট, বিশাল কালো দাড়ি-গোঁফ, কপালে সিঁদুরের ধ্যাবড়া টিপ। গায়ে লাল পোক। তার সামনে বিনীত ভাবে দাঁড়িয়ে সাতনা।

নয়ন ডাকল, “রামু! পালাও!” রামু আর দাঁড়াল না, নয়ন আর সে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল।

কতবার যে পড়ল দুজনে, কতবার ফের উঠল, তার হিসেব নেই। গাছের সঙ্গে বার-সতেক ধাক্কা খেল। পা-হাত ছড়ে গেল, কপাল ফুলে উঠল। তবু তারা দৌড়তে থাকে।

খানিকটা দূর দৌড়োবার পরই তারা বুঝতে পারে, পিছনে কারো হাঁকডাক নেই বটে, কিন্তু কেউ তাদের পিছু নিয়েছে ঠিকই। তারা যেদিকে যাচ্ছে, পায়ের একটা শব্দও সেদিকেই তাদের পিছু নিচ্ছে।

"নয়নদা, পিছনে কেউ আসছে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

.

২৭.

রামু বলল, "বড় হাঁফিয়ে গেছি।"

নয়ন বলল, "আমিও। এসো, বসে একটু জিরিয়ে নিই।"

ফিসফিস করে নয়ন বলে, "আসছে আমাদের পায়ের শব্দ শুনে-শুনে। নইলে এই জঙ্গলে আমাদের পিছু নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যদি বসে থাকি, তবে আমাদের পায়ের শব্দও হবে না, আর লোকটাও খুঁজে পাবে না আমাদের।"

বলতে-বলতে নয়ন বসে দম নিতে থাকে। রামুও। পিছনে পায়ের শব্দটাও আর হচ্ছে না।

রামু জিজ্ঞেস করে, "আমরা কতদূর এসেছি নয়নদা?"

"তা কী করে বলব? এ-জায়গা আমার চেনা নয়। জঙ্গলটাও ভারী জটিল। শুনেছি পুবধারে একটা দুর্ভেদ্য বাঁশবন আছে। সেই বন এত ঘন যে, শেয়ালও গলতে পারে না।"

"আমরা কি সেদিকেই যাচ্ছি?"

"তাও জানি না। আমরা খুব বেশি দূর আসতে পারিনি। ছুটবার সময় ডাকাতদের রাতপাহারার একটা হাঁক-ডাক শুনতে পেলাম যেন।"

রামু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাহলে চলো, আর-একটু দূরে যাই।"

নয়ন তার হাতখানা ধরে বসিয়ে দিয়ে কাহিল গলায় বলল, "খামোখা হয়রাণ হয়ে লাভ কী? গোলকধাঁধায় পড়ে আবার হয়তো গিয়ে ডাকাতদের আচ্ছায় হাজির হতে হবে। তার চেয়ে বসে থাকো। ভোর হলে আলোয় আলোয় চলে যাব।"

রামু জিজ্ঞেস করে, "কাপালিকটাকে দেখলে?"

"ভাল করে দেখিনি। যা ভয় পেয়েছিলাম।"

রামু একটা শ্বাস ফেলে বলল, "বিশাল চেহারা। ভাবসাব দেখে মনে হল সাতনাও ওকে খাতির করে।"

"তা হলে ও হল সাতনার ওপরের সর্দার। এ-দলে যে কে কোন্ পোস্টে আছে, তা বলা মুশকিল।"

"তান্ত্রিক কাপালিকরা কি ডাকাত হয়?"

"হাতে পারে। তা ছাড়া আসল কাপালিক কি না তাই দ্যাখো, ভেকও থাকতে পারে।"

যেখানে তারা বসে আছে, সে-জায়গাটায় গাছপালা তেমন ঘন নয়। শীতে গাছপালার পাতা ঝরে এমনিতেও একটু হাল্কা হয়েছে জঙ্গল। অন্ধকারে গাছপালা চেনা যায়, না, তবে এখানকার গাছগুলো সবই বড়-বড়। ঝোঁপঝাড় তেমন নেই। লম্বা ঘাসের ও আছে অবশ্য। তারা তেমনি বুক-সমান ঘাসের মধ্যেই বসে আছে। হাত বাড়ালে একটা শিশুগাছের গুঁড়ি ছোঁয়া যায়।

হঠাৎ রামু বলল, "একটা শব্দ পেলে নয়নদা?"

নয়ন একটু শক্ত হয়ে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, একটু একটু পাচ্ছি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ আসছে।

রামু বলল, "আসছে নয়, এসে গেছে। ওঠো নয়নদা, ছোটো।"

প্রাণের দায়ে নয়ন উঠল। কিন্তু ছুটতে গিয়েই ঘটল বিপদটা। কোত্থেকে একটা খেটে লাঠি ছিটকে এসে তার দুই পায়ের মধ্যে একটা ডিগবাজী খেল। তাইতে নয়ন পড়ল উপুড় হয়ে। আর একটা খেটে লাঠির পাল্লায় পড়ে রামুও চিতপটাং।

শিশুগাছের পিছন থেকে লোকটা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল। হাতে বল্লম। অন্য হাতে নড়া ধরে প্রথমে রামুকে দাঁড় করাল। ছোট্ট একটা চড় তার গালে কষিয়ে গমগমে গলায় বলল, "পালাতে চাইবে আর? ওই খেটে লাঠির ক্ষমতা জানো? এককালে ঠ্যাঙাড়ে ঠগীরা ওই দিয়ে দূর থেকে লোককে ঘায়েল করত। ফের যদি পালাও তো পাবড়া দিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

রামুর অবশ্য পালানোর মতো অবস্থা নয়। চড়টা খেয়ে তার মাথা ঘুরছে। সে উবু হয়ে বসে পড়ল।

নয়নকাজল আর ট্যাফো করল না। শোয়া অবস্থাতেই লোকটার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আজ্ঞে আর পালাব না।"

নোকটা দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে নিজেও মুখোমুখি বসল। অন্ধকারে আবছা যা দেখা যায় তাতে বোঝা যাচ্ছে লোকটার বয়স বেশি নয়। হালকা পলকা চেহারা বটে, কিন্তু গায়ে পেশ জোর রাখে। পরনে মালকোচামারা। ধুতি, গায়ে একটা বালাপোশের খাটো কোট, পায়ে নাগরা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাচ্ছিলে তোমরা?" নয়ন মাথা চুলকে বলল, "ঠিক পালাচ্ছিলাম না।"

"তাহলে কি এত রাতে জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছিলে?"

নয়ন একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে অনেকটা তাই, দিনকাল ভাল নয়। চারদিকে চোর-ছ্যাচড়ের উৎপাত। তাই চারদিকটায় একটু নজর রাখছিলাম আর কী।"

"এই জঙ্গলে চোর-ছ্যাচড় কী করতে আসবে?" ও লোকটা একটু অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে।

নয়ন বিগলিত হয়ে বলে, "বলা তো যায় না আজ্ঞে। আমাদের আড্ডায় তো মেলাই দামি জিনিস আছে।"

লোকটা এবার একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের একটা আচ্ছা আছে নাকি এখানে? তা সে আচ্ছাটা কোথায়?"

নয়ন ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে ঘন ঘন মাথা চুলকোতে থাকে। রামু বলে, "কেন, আপনি কি সাতনা ডাকাতের আড্ডা চেনেন না?"

লোকটা এবার উৎসাহে একহাত এগিয়ে আসে। চাপা গলায় বলে, "আরে, আমিও যে সেই আড্ডাটাই খুঁজতে বেরিয়েছি। জায়গাটা কোথায় বলো তো?"

রামু মাথা নেড়ে বলে, "তা আমরাও জানি না। আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। জঙ্গলের রাস্তা চিনি না। ফিরে যাওয়ার পথ বলতে পারব না।"

লোকটা বলে, "তোমরা পালিয়ে এসেছ কেন? তোমাদের কি ওরা ধরে রেখেছিল?"

"হ্যাঁ।"

“তোমার নাম কি রামু, উদ্ধববাবুর ছেলে তুমি?”

“হ্যাঁ।” রামু ভয়ে ভয়ে বলে।

লোকটা একটু হাসে। বলে, “আচ্ছা কাণ্ড যা হোক। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা ওদের দলেরই লোক।”

“আপনি কে?”

“আমাকে চিনবে না। আমি ডাকাতদের দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি।”

নয়ন ফস করে বলে ওঠে, “সে তো আমিও গিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা নতুন লোককে সহজে দলে নেয় না।”

লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, “নেবে। এলেমদার লোক দেখলে ঠিকই নেবে। তোমরা যদি কেবল পথটা বাতলে দিতে পারতে তাহলে আমার অনেক হয়রানি কমে যেত।”

নয়ন একটু গুম হয়ে থেকে বলল, “আপনি কেমন লোক কে জানে। খুব ভাল লোক যে নন তা বোঝাই যাচ্ছে। লোক আমিও ভাল নই। তাই আপনাকে বলতে বাধা নেই। আমার মনে হচ্ছে এই পশ্চিম দিকে নাক বরাবর এগোলে সেই আড্ডায় পৌঁছে যেতে পারবেন। তবে সাবধান, আচমকা বল্লম এসে বুকে বিঁধতে পারে। মাথায় লাঠি পড়তে পারে কিংবা ঘাড়ে রামদা’এর কোপ। ওরা বাইরের লোক পছন্দ করে না।”

লোকটা হেসে বলল, “কিন্তু তুমি তো ওদের দলের লোক।”

“না, আমি দল ছেড়ে পালাচ্ছি।”

"তাই কি হয়?" বলে লোকটা সাদা দাঁতে হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "তোমরা পালালে আমার এত পরিশ্রমই বৃথা যাবে। আমি তোমাদের ধরে আবার সাতনার আস্তানায় নিয়ে যাব চলো।"

নয়ন ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, "বলেন কী? এই তো গত পরশু সানার এক কসাই আমাকে বিষ-বিছুটি দিয়ে ছেড়েছে। আবার সেখানে যাব?"

রামুও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, "আপনি ডাকাত হতে যাচ্ছেন তো যান, আমাদের টানছেন কেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "তোমাদের ধরে নিয়ে গেলে সাতনা চট করে আমার ওপর খুশি হয়ে যাবে। তাছাড়া দলের ঘাঁতঘোঁতও কিছু তোমাদের কাছে জানার আছে আমার। আর দেরি করে লাভ নেই। ওঠো, উঠে পড়ো।"

নয়ন লোকটার পায়ে ধরার চেষ্টা করল। রামুও কঁদো-কাঁদো হয়ে অনেক কথা বলল। কিন্তু লোকটার নরম হওয়ার নাম নেই। খেটে লাঠিদুটো বগলে নিয়ে বল্লম বাগিয়ে সে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, "নাকি কান্না বন্ধ করো। তোমাদের এত সহজে ছাড়ছি না।"

অগত্যা বল্লমের মৃদু খোঁচা খেতে-খেতে দুজনে ম্লানমুখে লোকটার আগে আগে পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগল।

বেশি দূর হাঁটতে হল না। আধ-মাইলটাক হাঁটতেই অন্ধকারে বিশাল বাড়িটা দেখা গেল। আর দেখা গেল মশাল হাতে বিশ-ত্রিশজন লোক ছোটাছুটি হাঁকাহাঁকি করছে।

লোকটা বলল, "ওই বোধহয় সেই আড্ডা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যমদুয়ার।" নয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

আচমকা পিছন থেকে লোকটা একটা অমানুষিক "রে-রে-রে-রে" হাক ছাড়ল। সে এমন শব্দ যে মাটি কেঁপে ওঠে, গাছপালা নড়তে থাকে, দুর্বল লোকের হৃদপিণ্ড থেমে যায়। কোনো কথা নয়, শুধু "রে-রে-রে-রে" শব্দ বজ্রনির্ঘোষের মতো বেজে ওঠে।

সেই শব্দে মশালগুলো স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

.

২৮.

মশালের আলোয় সবার আগে সাত ফুট লম্বা সাতনাকে দেখা গেল এগিয়ে আসতে। হাতে টাঙ্গি। ভয় খেয়ে নয়নকাজল রামুর হাত চেপে ধরে বলল, "আর রক্ষে নেই। দেশে আমার বিধবা মাকে একটা খবর পাঠিয়ে দিও ছোটদাদাবাবু।"

রামু অত ঘাবড়ায়নি। সে তো জানে কাকাতুয়াটাকে দিয়ে এখনো আসল কথা বলাতে পারেনি এরা।

দলটা কাছে এগিয়ে আসতেই দুটো মুশকো চেহারার লোক এসে খপাখপ রামু আর নয়নকাজলকে ধরে পিছমোড়া করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

সাতনা গমগমে গলায় লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কে রে?"

লোকটা বেশ বুক চিতিয়েই জবাব দিল, "আমার নাম কিংকর। তুমি কেডা?"

"আমি সাতনা সর্দার।"

"ওঃ, তুমিই!" বলে লোকটা একটু হাসল। তারপর বলল "তোমার দলেই নাম লেখাতে এসেছি। আমি বর্ধমানের শংকর মাঝির শাকরেদ। নাম শুনেছ?"

"শংকর মাঝি।"

সাতনার গলায় রীতিমত ভক্তিশ্রদ্ধা ফুটে উঠল। ধরা গলায় বলল, "এ দলে আসবে নাকি?"

"হচ্ছে তো তাই।" বলে লোকটা জামার বুকপকেট থেকে বের করে সাতনার হাতে দিয়ে বলল, "এই হল শংকর মাঝির পাঞ্জা। বাঁকরো, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া যেখানে খুশি যে-কোনো দলে এই পাঞ্জা দেখালেই লুফে নেবে আমাকে। তবু তোমার দলেই এলাম কেন জানো? শুনেছি তোমরা একটা বড় দাও মারার ফন্দি এঁটেছ। সত্যি নাকি?"

সাতনার মুখটা একটু ব্যাজার হল। বলল, "সত্যি। তবে হিস্যা নিয়ে বেশি ঝাঁকাঝাঁকি কোরো না। আমাদের হিস্যাদার অনেক।"

সাতনা সর্দার তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শাকরেদদের বলল, "এ দুটোকে নিয়ে যা।"

তারপর লোকটার দিকে ফিরে বলল, "এদের তুমি পেলে কোথায় ধরেই বা আনলে কেন?"

লোকটা বলল, "ওদের মুখেই শুনলুম যে, ওরা তোমার আস্তানা থেকে পালিয়েছে। তাই ভাবলুম যার দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি তার একটু উপকার করি গে।"

সাতনা মৃদু হেসে বলে, "দল আমার নয়। আজ বড় সর্দার এখানেই আছে। চলো তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই।"

"চলো।"

শাকরেদরাও ওদিকে রামু আর নয়নকাজলকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। এ-বাড়ির মাটির নীচে গোটাকয় চোরকুঠুরি আছে। তারই দুটোয় দু'জনকে ভরে বাইরে থেকে ঝপাঝপ তালা মেরে দিল।

ভিতরে জমাট অন্ধকার। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। হাতে আর মুখে মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে বার বার। রামু বারকয়েক হাঁচি দিল নাক-সুড়সুড়ির চোটে। ঘরে কিছু নেই। না বিছানা চৌকি, না অন্য কোনো আসবাব। পায়ের নীচে শুধু ঠাণ্ডা মেঝে। তারই ওপর উবু হয়ে বসল সে। হাঁটু দুটো দুহাতে জড়িয়ে ধরে গুটিসুটি মেরে শীত তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে তুলতে লাগল।

চোরকুঠুরি থেকে কখন ভোর হল তা টেরও পায়নি রামু। একটা লোক এসে দরজা খুলে যখন নড়া ধরে তাকে হেঁচড়ে বের করে আনল, তখন সে দেখল বাইরে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

উঠোনের রোদে একটা দড়ির চারপাইতে বসে কাসার মস্ত গেলাসে খেজুর-রস খাচ্ছিল সাতনা। তার সামনে নিয়ে রামুকে খাড়া করা হল।

সাতনা একবার ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে চেয়ে গেলাসটা গলায় উপুড় করে বাড়িয়ে দিল বাঁ ধারে। গামছায় মুখ বাঁধা একটা হাড়ি নিয়ে মাটিতে বসে আছে একটা লোক। সে গেলাসটা তাড়াতাড়ি আবার ভরে এগিয়ে দেয়।

সাতনা রামুর দিকে লালচে চোখে চেয়ে বলে, "খুব খারাপ কাজ করেছিলে কাল রাতে। তোমার কি জানের পরোয়া নেই? কিংকরের হাতে পড়েছিলে বলে বেঁচে গেছ। নইলে জঙ্গল থেকে বেরোতেও পারতে না, বেঘোরে আমার দলবলের হাতে শিকার হয়ে যেতে।"

রামু কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

আরো কয়েক টোক খেজুর-রস খেয়ে সাতনা একটা মস্ত ঢেকুর তুলে বলল, "তোমাকে এবারের মতো মাপ করে দিলাম। বাচ্চা ছেলেদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই। কিন্তু খবর পেয়েছি, তোমার বাবা পুলিশে খবর দিয়েছে। তোমার খোঁজে লোকজনও লাগিয়েছে। কাজটা তোমার বাবা খুব ভাল করেনি। এখন যদি তোমাকে জ্যান্ত রাখি,

তবে আমাদের মেলা ঝামেলা। তাই ঠিক হয়েছে তোমার মাথাটা কেটে নিয়ে তোমার বাবার কাছে পাঠানো হবে।”

বলে সাতনা আর-এক চুমুক খেজুর রস খেল। আর রামুর শীত করতে লাগল।

সাতনা ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলল, “বুঝেছ?”

রামু একটু কঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, “আর নয়নদার কি হবে?”

“নয়ন?” বলে সাতনা অবাক হয়ে রামুর দিকে চেয়ে বলে, “নয়নের খবরে তোমার কী দরকার হে ছোঁকরা?”

“নয়নদার কিছু হলে তার বিধবা মা খুব কাঁদবে।”

“সে তো তোমার মা’ও কঁদবে।”

“আমাকে কেউ ভালবাসে না। বাবা না, মা না।” বলতে বলতে আজ রামুর চোখে জল এসে গেল। গলাটা এল ধরে।

সাতনা গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও কেমন থমকে গেল একটু। বারকয় গলা খাঁকারি দিল। হঠাৎ তার মনটা বোধহয় নরম হয়ে পড়েছিল। সেটা ঝেড়ে ফেলতে একটা বিকট হাঁকাড় দিল, “নিয়ে যা। নিয়ে যা একে।”

লোকগুলো তাকে জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পশ্চিম ধারে একটা ঢিবি, তার ওপাশে পচা ডোবায় মস্ত হোগলা-বন। ভারী নির্জন জায়গা। ঢিবি পেরিয়ে ডোবার ধারটায় রামুকে নিয়ে এল তারা। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। একদিকে ঢিবি র অন্যধারে হোগলার বন থাকায় জায়গাটা লোকচক্ষুর আড়ালও বটে। যে দু’জন লোক রামুকে ধরে এনেছে তারা দু’জনেই ভীষণ গড়া জোয়ান। কালো চেহারা। মুখে রসকষ নেই। একজনের

হাতে ঝকঝকে একটা ভোজালি। একজন রামুকে ধরে হাত দুটো মুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে চুল ধরে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে।

বিড়বিড় করে বলল, "এই বয়সে মরণ না-ডাকলে কেউ বাঘের ঘরে ঢোকে!"

রামু কোনো ব্যথা টের পাচ্ছিল না। পেট জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। গলা তেষ্টায় কাঠ। বুকটা দুঃখে বড় ভার হয়ে আছে। মরতে সে ভয় পাচ্ছিল না। শুধু দুঃখ হচ্ছিল তাকে কেউ ভালবাসে না বলে।

যে লোকটার হাতে ভোজালি সে একটা মসৃণ পাথরের মতো জিনিসে ভোজালিটা বারকয় ঘষে নিয়ে আঙুলে ধার দেখে নিল। তারপর বলল, "নে, হয়েছে। ভাল করে ধরিস। শেষ সময়টায় বড় ঝটকা দেয় কেউ কেউ।"

.

২৯.

জলার ধারে যখন এই ঘটনা ঘটছে, তখন একটু দূরে ঈশান কোণে একটা ভাঙা মন্দিরের উঁচু চাতালে দাঁড়িয়ে দুজন লোক দৃশ্যটা দেখছিল। আসলে দৃশ্যটা খুব মন দিয়ে দেখছিল একজন। সে কিংকর। আর দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ সাতনা লক্ষ্য করছিল কিংকরকে।

রামুর ঘাড়ের ওপর উদ্যত ভোজালিতে রোদ ঝিকিয়ে উঠতেই কিংকর আর সহ্য করতে পারল না। হাতের বল্লমটা চোখের পলকে তুলে শাঁ করে ছুঁড়ে দিল। এত দূর থেকে বল্লম যত জোরেই ছোঁড়া হোক, তা পৌঁছনোর

কথা নয়। তাছাড়া নিশানা ঠিক রাখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কিংকরের জাদু-হাত যেন বল্লমটাকে মন্ত্রঃপুত করে ছুঁড়ল। সেটা রোদে ঝিলিক হেনে হাউইয়ের মতো তেড়ে গিয়ে খুনেটার বাঁ কাঁধে বিঁধে গেল। ভোজালি ফেলে বাপ রে' বলে চেঁচিয়ে লোকটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে।

সাতনা এতটুকু চঞ্চল হল না। শুধু প্রকাণ্ড একখানা হাত বাড়িয়ে কিংকরের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বলল, "সাবাশ। বহোত খুব।"

কিংকর এই বাহবায় গলল না। চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা ডাকাত না ছুঁচো? কাপুরুষের দল! বাচ্চাদের যারা খুন করে, তারা কখনো মরদ নয়।"

সাতনা একটু হাসল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, "রামুকে খুন করা হত না হে। তোমাকে একটু পরীক্ষা করার জন্য ওটুকু অভিনয় করতে হল।"

কিংকর ফুঁসে উঠে বলল, "কিসের পরীক্ষা? তোমাদের মতো চুনোপুঁটির কাছে পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে তেমন ঠাউরেছ নাকি?"

সাতনা ঠাণ্ডা গলায় বলে, "আহা চটো কেন ভায়া! তুমি ভিন দলের লোক না শত্রুপক্ষের চর তা একটু বাজিয়ে দেখতে হবে না?"

কিংকর চোখ রাঙা করে তেজের গলায় বলল, "দেখ সাতনা, যতদূর জানি তুমি এ-দলের সামান্য মোড়ল মাত্র। সর্দার অন্ত্রিকবাবা কাল তোমাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না। বেশি ফেঁপরদালালি করবে তো সোজা সর্দারকে জানিয়ে দেব। আর একটা কথা, তোমার চেহারাটা বড়সড় বটে, ভোবো না বেড়ালের মতো তোমার নটা প্রাণ আছে। এ দুখানা শুধু-হাতে তোমার ওই মোষে গর্দান ভেজা-গামছার মতো নিংড়ে মুচকে দিতে পারি। কাজেই বুঝে-সমঝে চলো। আমি তোমার পালের মেড়াদের মতো নাই।"

সাতনার সঙ্গে এই ভাষায় এবং তেজের ভঙ্গিতে কেউ কথা কওয়ার সাহস পায় না। কিন্তু এই অগ্রাহ্যের ভাব সাতনা মুখ বুজে সয়ে গেল। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একটা ছেলেকে চিনতাম। তখন তার অল্প বয়স। ইসকুলে পড়ে। প্রতি বছর ইসকুলের

স্পোর্টসে ছেলেটা জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সেরা প্রাইজ পেত। বর্শা ছুঁড়ত এমন জোরে যে দেখে তাক লেগে যেত। বেঁচে থাকলে এখন সে তোমার বয়সীই হয়েছে।”

এ-কথা শুনে কিংকর একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তবু তেজের সঙ্গে বলল, “ওসব এলেবেলে কথা শুনতে চাই না। এবার থেকে কিংকরকে একটু সমঝে চলো। ”

দুজন লোক বল্লম-খাওয়া লোকটাকে ধরাধরি করে চাতালে এনে ফেলল। মুখে জল দেওয়া হচ্ছে রক্তে ভাসাভাসি কাণ্ড। চোট গুরুতর। তবে কাঁধে লেগেছে বলে প্রাণের ভয় নেই। সাতনার স্যাঙাতরা কটমট করে কিংকরের দিকে তাকাচ্ছে, একটু ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা নামিয়ে দেবে।

কিন্তু সাতনা তাদের দিকে তাকাল না। কিংকরকে বলল, “চলো, ভিতর বাড়িতে যাই। ভয় নেই, রামুকে কেউ এখনই খুন করবে না।”

কিংকর বলল, “না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ওই বাচ্চা-ছেলেটার গায়ে কেউ হাত তুলেছে বলে যদি টের পাই তবে সেই হাত আমি কেটে ফেলে দেব মনে রেখো।”

“বাপ রে!” বলে সাতনা হাসল, “তুমি যে আমাকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছ। ”

এ-কথায় কিংকরও হেসে ফেলল। তারপর ভিতরবাড়িতে গিয়ে উঠোনের রোদে দুজনে দুটো দড়ির চারপাইতে বসে খেজুর রস খেতে লাগল। কিংকর জিজ্ঞেস করল, “হঠাৎ আমাকে পরীক্ষা করার জন্য ওই ছেলেটাকে সাতসকালে খুনেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?”

সাতনা প্রথমটায় কথা বলল না। একমনে খেজুর রস খেয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, “দেখছিলাম ওই ছেলেটার প্রতি তোমার দরদ আছে কি না।”

কিংকর অবাক হয়ে বলল, থাকবে না কেন? ডাকাতি করি বলে তো আর অমানুষ নই।”

সাতনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, বলল, "তোমাকে যে সেই ছেলেটার কথা বলছিলাম, যে ইসকুলে জ্যাভেলিন থ্রোতে প্রতিবার ফার্স্ট হত, তার কথা আর একটু শুনবে নাকি?"

কিংকর একটু থতমত খেয়ে বলে, "তার মানে? তোমার কি মাথার গণ্ডগোল আছে নাকি বাপু? হঠাৎ পুরনো গপ্পো ফেঁদে বসতে চাইছ কেন?"

"সাধে কি আর চাইছি? গপ্পোটা তোমার জানা দরকার। এমনও তো হতে পারে যে, সেই ছেলেটাই তুমি।"

কিংকর হাতের রসসুষ্ঠু ভাঁড়টা হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার চোখ ধকধক করছে, লম্বা শরীরের পেশীগুলো জামার তলায় ঠেলাঠেলি করছে! থমথমে গলায় সে বলে, "সাতনা, বুঝতে পারছি খামোখা আমাকে ঝামেলায় জড়িয়ে, সকলের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুমি আমাকে দল থেকে হঠাতে চাইছ। কারণ আমি থাকলে এই দলে তোমার জায়গা আমার নীচেই হবে। তাই বলছি, ওসব হীন চক্রান্ত না করে এসো দুজনে মরদের মতো ফয়সালা করে নিই কে কত বড় ওস্তাদ। হাতিয়ার ধরতে হয় তো ধরো, নইলে খালি হাতে চাও তো তাই হোক। চলে এসো।"

এই চ্যালেঞ্জের জবাবে কিন্তু সাতনা নড়ল না। কেমন একরকম ক্যাবলা চোখে কিছুক্ষণ কিংকরের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "বোস কিংকর। না, তোমার সঙ্গে আমি কাজিয়া করতে চাই না। বোসো কথা আছে।"

রাগে ফুলতে ফুলতে কিংকর আবার চারপাইতে বসল।

সাতনা বলল, "তুমি খুব সাংঘাতিক লোক, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো, তোমারও একটা বৈ দুটো প্রাণ নেই।"

" জানি। ওসব ভয় আমাকে দেখিও না। কিংকরের একটাই জান বটে, কিন্তু সেটা মরদের জান। তোমার জান নয়। আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ো না।"

এতেও উত্তেজিত হল না সাতনা। শান্ত গলায় বলল, "তোমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। জানি। সে-চেষ্টা করছি না। শুধু জানতে চাইছি তুমি এ-দলে ঢুকলে কেন? তুমি তোমার মতো থাকো।"

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, "তা থাকতে পারছি কই? তুমি কথায়-কথায় আমাকে শাসাচ্ছ, লড়তে চাইছ। তার মানে ছুতোনাতায় আমার সঙ্গে তোমার লাগবেই। তাই মনে হয় তুমি আমাকে ভাল চোখে দেখতে পারছ না।"

কিংকর গম্ভীর গলায় বলে, "ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করলে ভাল চোখে দেখতে বাধা কী?"

সাতনা বলে, "বাধা আছে। তোমার বাধা আছে। আমার সব কিছু মনে থাকে। মানুষের মুখ আমি সহজে ভুলি না।"

কিংকরের মুখটা আবার হিংস্র হয়ে ওঠে।

সাতনা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, "কিছু বলতে হবে না। আমি মরদ কিনা সে-পরিচয় যথাসময়ে পাবে। এখন খ্যামা দাও। শুধু মনে রেখো সাতনার দশজোড়া চোখ সব জায়গায় তোমাকে নজরে রাখবে। দশজোড়া হাত তৈরি থাকবে। এক চুল বেয়াদবি দেখলে চোখের একটা ইশারা করব, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার মুণ্ডু খসে পড়বে।"

কিংকর ঝাঁকুনি মেরে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাস্তবিকই পিছন থেকে আচমকা দশখানা বল্লমের তীক্ষ্ণ ডগা পিঠ আর কোমর স্পর্শ করল। কিংকর উঠল না। কিন্তু একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "খুব মরদ।"

সাতনা খুব বড় একটা শ্বাস টেনে বলল, "তোমার সাহস আছে বটে।"

.

৩০.

কোনো কথা না বলে দুখানা তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ কিংকরকে দেখল সাতনা। তারপর বলল, "তোমার বড্ড ঝুঁজ হে। ঝাজালো লোক আমি পছন্দ করি বটে, তবে বেশি ঝাজ ভাল নয়।"

কিংকর কথা বলল না। কটমট করে তাকিয়ে রইল। সাতনা একটা হাঁক দিলে এক স্যাঙাত দৌড়ে আসে। সাতনা তাকে বলে, "যা, রামুকে ধরে নিয়ে আয়।"

কিংকরের পিছনে দশখানা বল্লম উঁচিয়ে আছে। সে অবশ্য গ্রাহ্য করল। একমনে খেজুর রস খায় আর মাঝে-মাঝে সাতনার দিকে আগুনপারা। চোখ করে চায়।

একটু বাদেই নড়া ধরে রামুকে নিয়ে এল সাতনার স্যাঙাত। অল্প সময়ের মধ্যেই রামুর মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখে আতঙ্ক। তাকে দেখে কিংকর সাতনার ওপর রাগে দাঁতে দাঁত পিষল।

সাতনা কিংকরকেই লক্ষ্য করছিল। একটু হেসে বল, "রাগ কোরো না হে। মায়াদয়া করলে আমাদের চলে না। ওহে রামু, এই লোকটাকে চেনো?"

রামু দিশাহারার মতো চারদিকে চেয়ে দেখল। তারপর কিংকরের দিকে তাকিয়ে বলল, "চিনি। এই লোকটাই কাল রাতে আমাদের ধরে এনেছে।"

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, "সে তো জানি। সে-কথা নয়। লোকটাকে আগে থেকে চেনো কিনা ভাল করে দেখে বলো তো।"

রামু ভাল করেই দেখল। আবছা-আবছা একটা চেনা মানুষের আদল আসে বটে, কিন্তু সঠিক চিনতে পারল না। মাথা নেড়ে সে বলল, "চিনি না।"

"খুব ভাল করে দেখলে চিনতে পারতে কিন্তু। অবিশ্যি তোমার দোষ নেই। এই লোকটা হরবোলা। একসময়ে সার্কাসে হরেক রকম পাখি আর জানোয়ারের ডাক নকল করত। যে-কোনো মানুষের গলা একবার শুনে হুবহু সেই গলায় কইতে পারে। সুতরাং গলা শুনে একে চিনবে না। আর চেহারা? যে-চেহারাটা এখন দেখছ সেইটেও এর আসল চেহারা নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি। দরকার শুধু থিয়েটারের সঙ সাজার কয়েকটা জিনিস। তাহলেই হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ.... . "

সাতনা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ল। কিংকর স্থির চোখেই সাতনার দিকে চেয়ে ছিল। কথা বলল না।

সাতনা হাসি থামিয়ে কিংকরের দিকে চেয়ে বলল, "তোমার অনেক গুণ। এত গুণ খামোখা নষ্ট করলে হে।"

কিংকর একটু হেসে বলে, "তোমারও অনেক গুণ। সেইসব গুণ তুমিও অকাজে নষ্ট করলে সাতনা। তবে বলি তোমার ক্ষতি করতে আমার আসা নয়। আমি তোমাকে দুটি কথা বলব। বেশ মন দিয়ে শোনো।"

সাতনা হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখ করে কিংকরের দিকে চাইল। তারপর বলল "শুধু গুল মেরে এই জাল কেটে বেরোতে পারবে না। কাজেই বলার আগে ভেবেচিন্তে নাও, যা বলবে তা সত্যি কিনা।"

"আমি যা বলব তা সত্যি। তবে এত লোকের সামনে বলা যাবে না। কথাটা বড়ই গোপন।"

সাতনা পাহাড় প্রমাণ শরীরটা টান করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "ঠিক আছে। চোরকুঠুরিতে চলো। তবে তোমার হাতদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা থাকবে।"

"ঠিক আছে। তাই-ই সই।"

"সার্কাসে তুমি হাতকড়া খোলার খেলা দেখাতে! আমার সব মনে আছে। কিন্তু এখন চালাকি করে হাতের দড়ি খুলতে যেও না আমার কাছে রিভলভার আছে। মনে রেখো।"

দুটো লোক এসে কিংকরের হাত পিছমোড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর সাতনা আর কিংকর গিয়ে ঢুকল চোরকুঠুরিতে।

কিংকরকে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসল সাতনা। হাতে সত্যিই ছ'ঘরা রিভলভার। বসে বলল, "যা বলার চটপট বলে ফ্যালো।"

"আমি কাকাতুয়াটাকে দিয়ে কথা বলাতে পারি।"

"পারো? বটে?" সাতনা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

কিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "পারি। অনেক ভেবেচিন্তে কায়দাটা বের করেছি। কিন্তু পাখিটা কথা বললে তোমরা সেই গুপ্তধন বের করবে। অথচ ওই গুপ্তধন তোমাদের পাওনা নয়। আইন বলে, যত গুপ্তধন পাওয়া যাবে তার সবই গবর্মেন্টের। কিন্তু তোমরা গবর্মেন্টকে এক পয়সাও দেবে না।"

সাতনা জলদগম্ভীর স্বরে বলে, "শুধু এই কথা?"

"না। আরো আছে। গোবিন্দ ওস্তাদকে চেনো। বেচারা মিথ্যে খুনের মামলায় ফেঁসে গেছে। অথচ তা উচিত নয়। আসল খুনীর উচিত নিজের দোষ স্বীকার করে নির্দোষ লোকটাকে খালাস করে দেওয়া।"

সাতনার মুখ ফেটে পড়ছিল দুর্দান্ত রাগে। খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বলল, "আর কিছু?"

"হ্যাঁ। আর একটা কথা। তোমার যে-মেয়েটা হারিয়ে গিয়েছিল, আমি তার সন্ধান জানি। সে যে তোমারই মেয়ে তার প্রমাণও দিতে পারি।"

আস্তে-আস্তে, খুব আস্তে-আস্তে সাতনার মুখে একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগল। কর্কশ, নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মুখোনা যেন কোমল হতে লাগল। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। একটা দমকা শ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট গলায় সে বলল, "মিথ্যে কথা!" একটু থেমে আবার বলল, "মিথ্যে কথা! তুই আমাকে ভোলাতে এসেছিস।"

বলতে বলতে সাতনা উঠে দাঁড়াল।

"না সাতনা, তোমাকে ভোলানোর ক্ষমতা আমার নেই। এই দ্যাখো-" বলে পিছন থেকে ডান হাত বের করে কিংকর তার বালাপোশের কোটের ভিতর দিকে হাত ভরে একখানা ফোটো বের করে আনল।

সাতনা হাঁ করে চেয়ে দৃশ্যটা দেখে বলল, "হাত খুলে ফেলেছ! তোমাকে বলেছিলাম না চালাকি করার চেষ্টা করলে- "

কিংকর অমায়িক একটু হেসে বলে, "আমার হাত কিছুতেই বাঁধা থাকতে পারে না, বুঝলে! আপনা থেকে খুলে বেরিয়ে আসে। যাকগে, আবার না হয় বাঁধতে বলে দাও।"

সাতনা জানে, সে-চেষ্টা বৃথা। হাত বাড়িয়ে সে ফোটোটা নেয়। অবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ে থাকে ফোটোটার দিকে। চোরকুঠুরিতে শুধু একটা ছোট্ট ঘুলঘুলি। দিয়ে আসা আলোতেও ফোটোর মেয়েটির মুখ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় সাতনা। তার মেয়ে চুরি যায় পাঁচ-ছ বছর বয়সে। এই মেয়েটির বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। কিন্তু কী হুবহু মিল। তার মেয়েটা বেঁচে থাকলেও এই বয়সীও হওয়ার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা কতদিন আগেকার ফোটো?"

"গত বছরে। তোমার মেয়ের বয়স এখন চোদ্দ বা পনেরো।"

"আর কোনো প্রমাণ আছে?"

"আছে। তবে তা দিয়ে আর তোমার দরকার কী? আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। এ তোমারই মেয়ে এবং সে বহাল তবিয়তে বেঁচেও আছে।"

সাতনা ভাল করে কথা বলতে পারছিল না বারবার টোক গিলছে। চোখে জল আসছে। অত বড় সা-জোয়ান লোকটার হাত দুটো কাঁপছে থরথর করে। সে জিজ্ঞেস করল, "আমার মেয়ে কোথায়?"

"সেইটে এখন বলতে পারছি না।"

"বলো!" বলে সাতনা প্রকাণ্ড দুটো হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল কিংকরকে। একটা রামঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "শিগগির বলো। নইলে মেরে ফেলব।"

কিংকর নিজের শরীরটাকে একটু মোচড় দিয়ে সরে গেল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে হাতটা তুলে সাতনার ঘাড়ে হাতের চেটোর ধার দিয়ে একটা কোপ মারল।

"আঁক্" করে একটা শব্দ হল শুধু। তারপর হাতির মতো বিশাল শরীর নিয়ে সাতনা ঢলে পড়ল মেঝের ওপর।

কিংকর ঘরের কোণে একটা জলের কুঁজো অনেকক্ষণ আগেই লক্ষ্য করেছে। এখন সেইটে তুলে এনে সাতনার চোখেমুখে জলের ছিটে দিতে পাগল।

একটু বাদেই চোখ মেলে উঠে বসল সাতনা।

কিন্তু এ এক অন্য সাতনা।

৩১-৩৬. ধীর গম্ভীর স্বরে সাতনা বলল

ধীর গম্ভীর স্বরে সাতনা বলল, “যে-হাত আমার গায়ে তুলছে, সে-হাত তোমার শরীর থেকে কেটে ফেলা হবে।”

কিন্তু সাতনা মুখে যা-ই বলুক, তার আর সেই ভয়ংকরতাও নেই। মুখটা কেমন ভোতা দেখাচ্ছে। চোখে একটা দিশেহারা ভাব। কিংকর একটু হেসে বলল, “ভয় দেখাচ্ছ নাকি? তোমার আমার জীবন যেরকম, যাতে কাউকে কারো ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। খামোকা চোখ রাঙিয়ে নিজের কাছে নিজেই হাস্যাস্পদ হচ্ছ। ভয় খাওয়ার হলে এতক্ষণে খেতাম।”

সাতনাও সেটা ভালরকমে টের পাচ্ছে। কিংকর কিছুতেই ভয় পাচ্ছে না। তাই সাতনা খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, “আমার মেয়ের ছবি যদি খাঁটি হয়ে থাকে, যদি জাল-জোচ্চুরি না করে থাকে তবে এ-যাত্রায় তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে। এখন বলো, আমার মেয়ে কোথায়?”

কিংকরের মুখ থেকে এখনো হাসি মুছে যায়নি। সে মাথা নেড়ে বলল, “ধীরে বন্ধু, ধীরে। অত তাড়া কিসের? তোমার শরীরে যে একটু নামমাত্র মায়াদয়া এখনো অবশিষ্ট আছে, তা ওই মেয়েটির জন্য, তা জানি। কিন্তু আমারও শর্ত আছে।”

সাতনা থমথমে মুখে বলল, “সেটা না-বোঝার মতো বোকা আমি নই। শর্তটা কী তা বলে ফ্যালো।”

“এক, দলের যে মাথা, তার নাম আমাকে বলতে হবে।”

“তার নাম জেনে কি হবে? ধরিয়ে দেবে?”

"সেটা পরে ঠিক করব। আগে নামটা'ত জানি।"

"আর কোন শর্ত আছে?"

"আছে। তোমাকে দল ছাড়তে হবে।"

সাতনা একটু ম্লান হেসে মাথা নাড়ল। "তোমার শর্তগুলো শুনতে ভাল কিন্তু কাজের নয়। প্রথম কথা, দলের বড়-সর্দারের নাম আমারও জানা নেই। দুনম্বর কথা হল, দল ছাড়া অসম্ভব। এ-দলে ঢোকা যায়, বেরোনো যায় না।"

কিংকর হাসি-মুখে বলল, "আমার তিন নমবর শর্ত হল, কোনো নির্দোষকে সাজা দেওয়া উচিত নয়। তাই বেচারা গোবিন্দ মাস্টারকে খালাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।"

সানা মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যদি এর কোনো শর্তই না মানি?"

কিংকর এবার হাসল না। মৃদু স্বরে বলল, "তোমার যে-মেয়ে যাওয়ার পর তুমি মানুষ থেকে পশু হয়েছ, সেই মেয়ের খোঁজ জীবনেও পাবে না।"

সাতনা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কিংকরের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর কেমন ভ্যাবলার মতো বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, "রাত দুটোর সময় আবার এই চোর-কুঠুরিতে এসো। কথা হবে।"

"কিন্তু বাইরে যে-সব যমদূত মোতায়েন আছে তারা আবার পিছু নেবে না তো?"

"বারণ করে দিচ্ছি। এখন তুমি স্বাধীন।"

দুজনে বেরিয়ে এল।

সাতনার মুখ নিচু। ভাবছে। মাঝে-মাঝে হারানো মেয়েটার কথা ভেবে চোখে জল আসছে তার। হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছছে মাঝে-মাঝে, সাতনার চোখে জল! ব্যাপারটা তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই কিংকর নামে লোকটা কে, তা ভেবে সারাদিন রামুর মাথা গরম। গতকাল রাতে জঙ্গলের অন্ধকারে প্রথম দেখা। লোকটা তাদের ধরিয়ে দিল। কিন্তু আজ সকালে আবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাল। সাতনা

যখন তাকে ডাকিয়ে নিয়ে লোকটাকে চিনতে পারে কি না জিজ্ঞেস করল, তখন তার স্পষ্টই মনে হল, যে কিংকরকে চেনে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারল না, কোথায় দেখেছে বা কবে।

আজ সকালেই ডাকাতরা তার গলা কাটতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আজই আরার কী মন্ত্রে যেন তারা ভারী সদয় হয়েছে তার ওপর। সকাল থেকে কিছু খেতে দেয়নি। কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ একজন নরম-সরম চেহারার ডাকাত এসে জামবাটি-ভরা সর-ঘন দুধ কলা আর নতুন গুড় দিয়ে মাখা চিড়ের ফলার খাওয়াল। তারপর ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "যাও খোকা, ঘুরে-টুরে বেড়াও গিয়ে। তোমাকে আর ঘরে আটকে রাখার হুকুম নেই।"

রামু বেরিয়ে এল। চারদিকে আলো আর গাছপালা। মুক্ত বাতাস। বুক ভরে শ্বাস টানল সে। ডাকাতরা কেন সদয় হয়েছে তা বুঝতে পারল না।

ছেড়ে দিলেও রামুর পিছু-পিছু ছায়ার মতো একজন পাহারাদার রেখেছে। এরা। ভাঙা প্রকাণ্ড বাড়িটার সব জায়গায় যাওয়া বারণ। লোকটা মাঝে-মাঝে পিছন থেকে সাবধান করে দিচ্ছে, "ওদিকে যেও না খোকা। না না, ওই কুঠুরিতে উঁকি মেরো না।"

ঘুরতে ঘুরতে নয়নদার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল রামুর। নয়নকাজল দিব্যি হাসিমুখে পিছন দিককার একটা বাগনে রোদে বসে গায়ে সর্ষের তেল মালিশ করতে করতে একজন

রোগা-পটকা পশ্চিমা ডাকাতের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছিল। "ছাপরা জিলা হাম খুব চিনতা। ওদিকে খুব ভাল দুধ মিলতা।"

রামু চেঁচিয়ে ডাকল, "নয়নদা।"

নয়ন একগাল হেসে বলল, "তোমাকেও ছেড়ে দিয়েছে? যাক বাবা! আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

রামু কাছে গিয়ে বসে একটু নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, কিংকর লোকটা কে বলো তো?"

নয়ন নিশ্চিন্ত গলায় বলে, "সাংঘাতিক ডাকাত। এ সাতনার চেয়েও ভয়ংকর।"

"তা তো বটে, কিন্তু তোমার চেনা-চেনা লাগছে না?"

নয়নকাজল একটু ভেবে বলল, "তুমি কথাটা বললে বলেই বলছি, আমারও মনে ওরকম একটা ভাব হয়েছিল। লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি। তারপর ভাবলাম, দেখলেও সে-কথা মনে না রাখাই ভাল। লোকটা এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক। আমাদের কাল রাতে ধরিয়ে দিল। আর-একটু হলেই পালাতে পারতাম।"

রামু বিষণ্ণ মুখে বলে, "পালিয়ে লাভটা কী হত? বাড়ি গিয়েও তো রক্ষা পেতাম না। তুমিও না, আমিও না।"

নয়ন চিন্তিত মুখে বলে, "তা বটে।"

"লোকটা হয়তো আমাদের ভালর জন্যই ধরিয়ে দিয়েছে। হয়তো এর পিছনে কোনো কারণ আছে। লোকটা জানত, পালিয়েও আমরা বেশিদূর যেতে পারব না। গেলেও বাঁচব না এদের হাত থেকে।"

নয়ন খুব মিনমিন করে বলল, "আমি অত ভেবে দেখিনি। কিন্তু এখন তুমি বলার পর দ্যাখো ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।"

"কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নয়নদা, কিংকর লোকটা আমাদের শত্রু নয়।"

"না হলেই ভাল। ওরকম লোক যার শত্রু হবে, তার অনেক বিপদ।"

দুপুরে স্নান করে রামু আর নয়ন একটা ছোটোখাটো ভোজ খেল আজ। নতুন একটা ঘরে খড়ের ওপর পাতা নরম বিছানায় দুজনে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিল অনেকক্ষণ। কাল রাতে অনিদ্রা গেছে। যখন উঠল, তখন বেলা ফুরিয়ে এসেছে। রামু দেখল তার বালিশের পাশে একটা ছোট্ট চিরকুট এক টুকরো পাথর চাপা দেওয়া। তাতে লেখা, "আজ রাতে সজাগ থেকো।"

আশা আর ভরসায় রামুর বুক ভরে উঠল। সে নয়নকাজলকে ঠেলে তুলে দিল। তারপর চিরকুটটা দেখিয়ে বলল, "আমার মনে হয় এটাও সেই কিংকরের কাজ।"

ঠিক রাত দুটোয় সানা চোর-কুঠুরিতে হাজির হল। সারাদিন কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে কিছুটা। বেশ নড়বড়ে আর বুড়ো দেখাচ্ছে দানবের মতো লোকটাকে।

চোর-কুঠুরিতে কোনো আলো নেই। জমাট অন্ধকার। কিন্তু সাতনা মৃদু একটু শ্বাসের শব্দ শুনে বুঝল, কিংকরও হাজির।

গলা খাঁকারি দিয়ে সাতনা ডাকে, "কিংকর। "বলো।"

"এখানে নয়। বড় সর্দারের হাজারটা চোখ, হাজারটা কান। চলো, জঙ্গলের দিকে যাই।"

"তথাস্তু। তোমার লোকজন আজ কেমন পাহারা দিচ্ছে?"

"পাহারা নেই। বেশির ভাগই গেছে কাছের একটা গঞ্জে ডাকাতি করতে। বাদবাকিদের আমি ছুটি দিয়েছি।"

"তাহলে চলো।"

দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। তারপর আগে সাতনা এবং তার পিছনে কিংকর ছায়ার মতো জঙ্গলে গিয়ে ঢোকে।

নিস্তব্ধ জঙ্গলাকীর্ণ একটা জায়গায় এসে দুজনে দাঁড়ায়।

সাতনা বসে। মুখোমুখি কিংকর। সাতনা বলে, "আমি রাজি।"

"ভাল করে ভেবে বলো।"

"ভেবেই বলছি। দুনিয়ায় ওই মেয়েটা ছাড়া আমার কেউ নেই। মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমার মাথায় খুন চেপেছিল। সারকাস ছেড়ে ডাকাতের দলে নাম লিখিয়েছিলাম। আজ সারাদিন ভেবে দেখলাম, মরতে একদিন হবেই। তার আগে যদি সুযোগ পাই, মেয়েটার একটা হিল্লে করে দিয়ে যাই। একবার তাকে চোখের দেখাও তো দেখতে পাব।"

"তা পাবে।"

"যখন ছোট্টটি ছিল, তখন সারাদিন আমার বুকের সঙ্গে লেগে থাকত মেয়েটা। মা-মরা মেয়ে। তাকে বুকে করে সারকাসের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরতাম। মেয়েটাই ছিল আমার জীবন, আমার শ্বাসের বাতাস আমার নয়নের মণি।"

"জানি সাতনা।"

"সকলেই জানত। জানত, সাতনার মেয়েই সাতনার সর্বস্ব।"

"এবার বড় সর্দারের নামটা বলো সাতনা।" সাতনা একটু চমকে উঠল।

.

৩২.

সাতনার মতো ডাকাবুকো লোককে আঁতকে উঠতে দেখে একটু হাসল কিংকর। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, "ভয় পাচ্ছ?" সাতনা চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। তারপর ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় বলল, "পাচ্ছি। আমার আয়ু আর বেশিদিন নয়। আজ অবধি সর্দারের চোখকে কেউ ফাঁকি দিতে পারেনি। আমিও পারব না। তবু জেনেশুনে যে হাঁড়িকাঠে গলা দিচ্ছি, তার কারণ আমার কাছে আর নিজের প্রাণের দাম নেই। শুধু একটাই সাধ। মরার আগে যেন মেয়েটার মুখ একবার দেখে যেতে পারি। "

কিংকর একথার জবাব দিল না চট করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "তোমার কি ধারণা, সর্দার তোমার ওপর নজর রাখছে?"

সাতনা মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। কিন্তু মনে-মনে যেই ঠিক করেছি যে, সর্দারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব, তখনই মনে ভয়টা এল। কোন্ মানুষের মনে কী আছে তা সর্দার মুখ দেখলেই টের পায়।"

কিংকর মৃদুস্বরে বলল, "মানুষের মুখে যে তার মনের কথা লেখা থাকে। সর্দার তো আর অন্তর্যামী ভগবান নয়, সে শুধু তোমাদের চেয়ে আর এক ডিগ্রী বেশি চালাক। এ-লাইনে আমার গুরু হল শংকর মাঝি। সে তোমাদের মতো নোংরা ডাকাত নয়। টাকা-পয়সা সোনাদানায় লোভ নেই। সারাদিন জপ-তপ নাম-ধ্যান নিয়ে থাকে। লোকের ওপর কখনো খামোখা হামলা করে না। শুধু অন্যায় দেখলে রুখে দাঁড়ায়। লোভ-লালসা নেই বলে তার মনটাও পরিষ্কার। চোখটাও পরিষ্কার তোমাদের সর্দারের চেয়ে লোকের মন বোঝবার ক্ষমতাও তার বেশি। শংকর মাঝি একবার আমাকে বলেছিল, পাপী তাপী খুনে গুণ্ডা বা বদমাশদের ফাঁসিকাঠে ঝোলালে বা জেলে ভরে রাখলেই কি আর তাদের ঠিক-

ঠিক সাজা হয় রে? লোকটার মনে অনুতাপ জাগাতে পারলে বরং সেইটেই ঠিক শাস্তি। একটা ডাকাতকে যদি ভালো করে তুলতে পারিস তবে দেখবি তার মত মানুষই হয় না।

সাতনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি শংকর মাঝির দলে কতদিন ছিলে?"

"বছর-দুই। তার কাছে অনেক কিছু শিখেছি।"

সাতনা একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলে, "অনেক কিছু শিখেছ বটে, কিন্তু আগুন নিয়ে এই খেলাটা না খেললেও পারতে। আমার মেয়ের খবর এনে আমাকে দুর্বল করে ফেলেছ, কিন্তু তা বলে তো আর বড় সর্দারের মন গলবে না। তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর মন্ত্রটা কে তোমাকে এখন শেখাবে?"

কিংকর নির্ভীক গলায় বলে, "বড় সর্দার ভগবান নয়, আগেই বলেছি। যত ক্ষমতাই থাক, তারও কিছু দুর্বলতা আছে, ভয় আছে। একবার তার মুখোশটা খুলতে দাও, তখন দেখবে।"

মাথা নেড়ে সাতনা বলে, "মুখোশ বা মুখ কোষ্টা তা আমিও জানি না। শুধু জানি, সর্দার মস্ত তান্ত্রিক। মারণ উচাটন বশীকরণ সব জানে। মানুষের মনের কথা টের পায়। আর জানি, পুলিশ বা গভর্মেন্টের সাধ্য নেই যে তাকে ধরে। তুমি তার ডেরায় ঢুকে মস্ত ভুল করেছ। তুমি পুলিশের লোক গভর্মেন্টের চর তা জানি না। শুধু জানি, যাই হয়ে থাকো, সর্দারের হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

কিংকর হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমার একটা শর্ত ছিল, নির্দোষ গোবিন্দ মাস্টারকে খুনের দায় থেকে রেহাই দিতে হবে। সেটা ভেবে দেখেছ?"

সাতনা বিষাক্ত গলায় বলল, "আমাকে তার জন্য কী করতে হবে।"

"দায়টা তোমাকে নিজের ঘাড়ে নিতে হবে।"

“নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু যে মামলা বহুকাল আগে চুকেবুকে গেছে, আসামির ফাঁসির হুকুম পর্যন্ত হয়ে গেছে তা আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে আদালত চাইবে কি? তা ছাড়া আমি স্বীকার করলেই তো হবে না, আদালত চাইবে প্রমাণ। তার ওপর আসামী জেলহাজত থেকে পালিয়েছে, সেটাও তোমত অপরাধ। পুলিশ তাকে এত সহজে ছাড়বে না।”

“সে আমরা বুঝব। তুমি তোমার কাজটুকু করলেই হবে।”

“করব। এখন আমাকে আমার মেয়ের কাছে নিয়ে চলো।”

ট্যাক থেকে একটা মস্ত পকেট-ঘড়ি বের করল কিংকর। ঝুঝকো অন্ধকারে অনেকক্ষণ তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে থেকে সময়টা ঠাহর করল। তারপর বলল, “আর আধঘণ্টা। তারপর কিছু কাজ সেরে বেরিয়ে পড়ব দু’জনে।”

সাতনা সন্ত্রস্ত হয়ে বলে, “সময় দেখলে কেন? কিসের আধঘণ্টা?”

কিংকর মৃদুস্বরে বলল, “তোমার যেমন দলবল আছে আমারও তেমনি একটা ছোট্ট দল আছে। তাদের আজ রাত্তিরে এখানে পৌঁছানোর কথা।”

সাতনা অস্ফুট একটা শব্দ করে দুহাতে মুখ ঢাকল। মিনিটখানেক বাদে মুখ তুলে বলল, “তার মানে কী? তুমি কি লড়াই করতে চাও?”

কিংকর মাথা নেড়ে বলল, “না। লড়াই হবে না। তোমার যে কয়জন স্যাঙাত আছে, তাদের ঠেকিয়ে রাখবে তুমি। আমরা বিনা লড়াইয়ে যুদ্ধ জিতে তোমাদের বেঁধে নিয়ে যাব। আর তাহলে বড় সর্দারের মনে তোমার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আসবে না।”

“বড় সর্দারকে কি ছেড়ে দেবে তাহলে?”

কিংকর অন্ধকারেও একটু হাসল। “না। বড় সর্দারের জন্য আমি তো রয়েছি।”

"কে বলল নেই?" কিংকর আবার একটু হাসে। মৃদুস্বরে বলে, "আমি যে বড় সর্দারের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।"

আর ঠিক এই সময়ে একটা মস্ত কণ্টিকারির ঝোঁপের ওপাশ থেকে একটা ভারী পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল।

সাতনা পাথর হয়ে বসে থাকে। কিছুক্ষণ শ্বাস ফেলতে পর্যন্ত ভুলে যায়। কিংকর মৃদু হেসে বলে, "কী হে, বিশ্বাস হল?" সানার মুখে বিস্ময়ে কথা এল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কিংকর স্বাভাবিক গলাতেই বলে, "তোমার মতো সর্দারও আমাকে বিশ্বাস করেনি। সারাক্ষণই আবডাল থেকে নজর রেখেছিল।"

"তবু ভয় পাচ্ছ না?"

"না। কিন্তু আমার আর সময় নেই। তুমি ওঠো, স্যাঙাতদের গিয়ে বলল, গায় একটা ছোটখাটো হামলা হবে। তারা যেন বাধা না দেয়। বাধা দিলে রক্তের গাঙ হয়ে যাবে।"

সাতনা উঠল। অসহায়ভাবে বলল, "আর বড় সর্দার?"

"তার কথা আমার খেয়াল আছে। তুমি ভেবো না। যাও।" সাতনা দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে ভাঙা কেল্লার দিকে এগোতে লাগল।

তার ছায়ামূর্তির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল কিংকর। তারপর ট্যাকঘড়িটা আর-একবার দেখে নিয়ে খুব টানা নিচু পর্দায় একটা শিস দিল। এমনই সে শব্দ যে, জঙ্গলের অন্যান্য শব্দের মধ্যে ঠিক ঠাহর হয় না।

শিসটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুঘুর ডাক ভেসে এল কাছ থেকে। নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল কিংকর। তার দল এসে গেছে।

কিংকর উঠে চকিত-পায়ে কেল্লার দক্ষিণ কোণের দিকে চলে এল। ভাঙা ইদারার পাশে দুটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে।

কিংকর সাবধানী গলায় ডাকল, "রামু।"

"আজ্ঞে।"

"এসো।" বলে কিংকর হাত বাড়িয়ে রামুর একটা হাত ধরে। রামুর পিছনে নয়নকাজল দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে কাকাতুয়ার দাঁড়। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, "আবার আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? সেদিনকার মতো নতুন কোনো বিপদে পড়ব না তো?"

কিংকর একটু হেসে বলে, "না। বিপদের মধ্যেই তো আছে। বিপদকে ভয় করলে কি চলে?"

ধীরে ধীরে তিনজন গভীর জঙ্গলের দিকে এগোতে থাকে। অন্যদিক দিয়ে দশ-বারোটা ছায়ামূর্তি দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে কেল্লায় গিয়ে ঢোকে।

একটা বাঁশঝাড় গোল হয়ে একটা চত্বরকে ঘিরে রেখেছে। বাইরে থেকে ভিতরকার ফাঁকা জায়গাটা বোঝা যায় না। কিংকর সেইখানে এনে রামু আর নয়নকাজলকে দাঁড় করাল! বলল, "আমার একটা কাজ বাকি আছে। সেটুকু সেরেই আসছি।"

নয়নকাজল উদ্বেগের গলায় বলে, "যদি কোনো বিপদ হয় এর মধ্যে?"

"তাহলে, ভগবান দুখানা পা তো দিয়েছেন, দৌড় মেরো।"

কিংকর আর দাঁড়ায় না। অতি দ্রুত পায়ে সে দৌড়তে থাকে কেল্লার দিকে। যেতে-যেতেই দেখে, দশ-বারোজন লোক পাঁচ-সাতজন লোককে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে আর ভ্রুক্ষেপ করে না কিংকর।

কেল্লায় ঢুকে সে জোর কদমে ছুটে একদম বায়ুকোণে চলে আসে। পুরনো ভাঙা খিলান গম্বুজের ভিতর একটা মিনার। তাতে ঢোকার কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু কিংকর দিনের বেলায় লক্ষ্য করেছে এই মিনারের গায়ের কারুকাজ একটু অন্যরকম। খাঁজগুলো কিছু বেশি গভীর।

চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে কিংকর বানরের মতো সেই খাঁজগুলোয় হাত আর পা রেখে উঠে যেতে থাকে ওপরে।

কিন্তু বেশিদূর উঠতে হয় না তাকে। উপর থেকে একটা ঝাঁঝালো টর্চের আলো এসে পড়ে তার ওপর। আর সেইসঙ্গে একটা গুলির শব্দ।

.

৩৩.

গুলিটা একেবারে চুল ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। প্রাণের ভয়ে অনেকটা উঁচু থেকেই কিংকর লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। একটা ভেঙে পড়া থামের আড়ালে গা ঢাকা দিতে যাবে, তার আগেই পরপর আরও দুটো গুলি। তবে মিনারের মাথা থেকে এত দূরের পাল্লায় রিভলবারের গুলি ততটা বিপজ্জনক নয়। রাইফেল হলে এতক্ষণে কিংকর ছ্যাঁদা হয়ে যেত।

থামের আড়াল থেকে মিনারের মাথাটা লক্ষ্য করল কিংকর। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। শুধু বোঝা যায়, একটা মস্ত মানুষের ছায়ামূর্তি একটু ঝুঁকে নীচের দিকে নজর রাখছে। টর্চটা মাঝে-মাঝে ঝিকিয়ে চারদিকে আলো এসে পড়ছে কিংকরের।

হঠাৎ কিংকরের কাঁধে একটা ভারী হাত আলতো করে রাখল কেউ। একটু চমকে উঠেছিল কিংকর। পিছন থেকে একটা ভারী গলা তার কানে কানে বলল, “সর্দারকে অত সহজে বাগে আনতে পারবে না।”

"সাতনা! তুমি এখনো যাওনি?"

"আমি গেলে সর্দারকে লড়াই দেবে কে? একা তোমার কর্ম নয়।"

"মিনারের ওপর লোকটাই কি সর্দার?"

"হ্যাঁ। সর্দারের আজ এখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু কিছু একটা আঁচ পেয়ে সর্দার আবার ফিরে এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমার সঙ্গে এসো।"

"কোথায়?"

"কাকাতুয়ার কাছে। একমাত্র কাকাতুয়াটাই জানে ওই মিনারে ঢোকার গুপ্ত পথ। আমরা অনেকদিন ধরে তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছি কিন্তু পাখিটা বলেনি। এখন শেষ চেষ্টা করে দ্যাখো, যদি তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারো।"

"কিন্তু সর্দার যদি পালায়?"

"গুপ্তধন না নিয়ে সর্দার পালাবে না। ও এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন। মই লাগিয়ে আমরা প্রত্যেকটা মিনারের মাথায় চড়েছি। আশ্চর্য এই যে, তিনটে মিনারের মাথায় গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখও মিলেছে। সেই পথ ধরে আমরা পাতালেও নেমেছি। কিন্তু বৃথা। গোলকধাঁধার মতো কিছু গলিখুঁজি ছাড়া আর কিছু পাইনি। এই মিনারের সুড়ঙ্গটাও তাই। তবু সর্দার শেষ চেষ্টা করতে ওখানে উঠেছে। সহজে পালাবে না।"

কিংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লোভই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সে বলল, "কাকাতুয়াটা রামু আর নয়নকাজলের কাছে আছে। চলো।"

বাঁশবনে ঘেরা নিরাপদ জায়গাটায় পৌঁছে তারা দেখল, দুজন জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। দাঁড়ে বসে ঝিমোচ্ছে কাকাতুয়া। টর্চের আলো চোখে পড়তেই ডানা ঝাঁপটে বলে উঠল, "মেরো না, মেরো না আমাকে বিশু।"

"সবাই পাখিটার কাছে গুপ্তধনের সন্ধান জানতে চেয়েছে। পাখিটা বলেনি। কিংকর এবার পাখিটার সামনে বসে খুব আদরের গলায় বলল, "না না, বিশু তোমাকে মারবে না।"

পাখিটা ডানা ঝাঁপটে বলে, "আলমারিতে টাকা নেই। টাকা আছে...। "

কিংকর চাপা গলায় বলে, "বোলো না, বোলো না, টাকার কথা বোলো না।"

পাখিটা আবার ডানা ঝাঁপটায়। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, "তিন নম্বর মিনার। পাথর সরাও, পাথর সরাও।"

"পাথর নেই।"

"তলার দিকে। পাথরে চিহ্ন আছে।" কিছুক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না। তারপর কিংকর উঠে দাঁড়াল। সানা বলল, "তিন নম্বর মিনারের মাথাতেই এখন সর্দার থানা গেড়েছে।"

কিংকর মৃদু হেসে বলে, "মিনারে চড়তে হবে না। পাখি কী বলল শুনলে তো। মিনারের গোড়ায় আর একটা পথ আছে। চলো! যদি পারো একটা শাবল নিয়ে এসো চট করে।"

দুজনে যখন আবার মিনারটার কাছে এল, তখন ওপরটা অন্ধকার। কোনো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে না।

মিনারের গোড়ার দিকে চৌকো-চৌকো পাথর গাঁথা। তার ওপর নকশা। টর্চ জ্বেলে কিংকর পরীক্ষা করে দেখল, সব নকশাই একরকম। কোন্টা নির্দিষ্ট পাথর এবং তাতে কী চিহ্ন

আছে তা বোঝা মুশকিল। কিংকর হাঁটু গেড়ে বসে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে থাকে। বহু পুরনো আমলের নকশাগুলো সব ক্ষয় হয়ে এসেছে। তবু কিংকর বুঝবার চেষ্টা করে।

আচমকা ওপর থেকে আবার এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আওয়াজ। দুজনের খুব কাছাকাছিই গুলি দুটো মাটিতে গেঁথে যায়। সাতনা অন্ধকারে কী একটা জিনিস মাথার ওপর তুলে ধরে। কিংকর তাকিয়ে দেখে, মস্ত একটা লোহার ঢাল। ছাতার মতো বড়। পুরনো আমলের ভারী জিনিস দেখে একটু হাসে সে, সাতনার বুদ্ধি আছে।

ওপর থেকে পর-পর আরো দশ-বারোটা গুলি ছুটে আসে। দু-চারটে টকাটক ঢালের ওপরও এসে পড়ে।

সাতনা চাপা গলায় বলে, "সর্দার নেমে আসছে মনে হয়। তাড়াতাড়ি করো।"

কিংকর নিশ্চিন্ত গলায় বলে, "আমরা দুজন, ও একা। ভয় কী?"

সাতনা মৃদু একটু হেসে বলে, "সর্দারকে চেনো না তাই বলছ। দু-দশ জনের মহড়া নেওয়া সর্দারের কাছে জলভাত। আমার এই লোহার মতো। পাঞ্জা একবার সর্দার একটু চেপে ধরেছিল। তখনই বুঝেছিলুম, এর সঙ্গে ইয়ার্কি নয়।"

কিংকর এসব কথায় কান দেয় না। মন দিয়ে খুঁজতে থাকে। অনেক নিরিখ-পরখ করে তার মনে হয়, একটা পাথরের একটা কোনায় যেন খুব অস্পষ্ট একটা তীরের চিহ্ন আছে। খুবই অস্পষ্ট আন্দাজ। তবু এখন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া ছাড়া উপায়ও তো নেই। শাবলটা পাথরের খাঁজে ঢুকিয়ে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে চাড় দিতে লাগল সে।

ঠিক এই সময়ে হাত দশেক ওপর থেকে সর্দারের রিভলবার দু ঝলক আগুন ওগরায়। এখন এত কাছ থেকে তার নিশানা ভুল হয় না। ঢাল ঘেঁষে দুটো গুলিই কিংকরের পায়ের কাছে গেঁথে যায় মাটিতে।

কিংকর মুখ তুলে সাতনাকে বলে, "হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? পালটা গুলি চালাও।"

সাতনা মাথা নেড়ে বলে, "তা হয় না। ভাল যোক মন্দ হোক, সর্দার আমার গুরু। তাকে মারতে পারব না।"

কিংকর হাত বাড়িয়ে বলে, "তবে আমাকে অস্তরটা দাও।"

"তাও হয় না। আমার অস্ত্র দিয়ে ওকে মারা চলবে না।"

"তা বলে ওই পাষণ্ডটার হাতে মরবে নাকি?"

"আমার চেয়ে সর্দার তো বেশি পাষণ্ড নয়। দুজনেই সমান পাপী, তাহলে কে কার বিচার করবে বলো!"

ঢালের আড়াল থেকে খুব সাবধানে মুখ বের করে কিংকর ওপরের দিকে চেয়ে দেখল একটু। প্রকাণ্ড একটা ছায়ামূর্তি প্রায় বাদুড়ের মতো ঝুলে ঝুলে নেমে আসছে। মিনারের অগভীর খাঁজে স্রেফ আঙুলের সাহায্যে শরীরের ভার নিয়ে নেমে আসা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ পারে সার্কাসের বাজিকররা। সর্দার নামছেও বেশ তাড়াতাড়ি। একবার থেমে একটা হাত ঘুরিয়ে নীচের দিকে তাক করল যেন। সাঁত করে ঢালের আড়ালে মাথা টেনে নেয় কিংকর। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি এসে মাটি ছিটকে দেয় খানিকটা। একটা রিভলবারে এত গুলি থাকার কথা নয়। কিংকর অনুমান করল, সর্দারের কোমরে অন্তত গোটা চারেক রিভলবার আছে। একটার গুলি ফুরোলে আর একটা চালাচ্ছে।

শাবলে আর একটা চাড় দিতেই পাথরটা নড়ে উঠল। শাবল টেনে নিয়ে পাথরের অন্য ধারে ঢুকিয়ে আবার চাড় দেয় কিংকর। পাথরটা আলগা হয়ে ঢকঢক করে নড়ে। শাবল ফেলে দু হাতে মত পাথরের চাইকে ধরে টান দেয় কিংকর।

ধড়াম করে পাথরটা খসে পড়ে মাটিতে। আর সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড বাঘের মতো সর্দারও লাফ দিয়ে নামে নীচে। নেমেই রিভলভার তুলে বিকট গলায় হাঁক দেয়, "খবর্দার! প্রাণে বাঁচতে চাস তো পালা। মাত্র দশ সেকেণ্ড সময় দেব। পালা!"

ঢালের নিরাপদ আড়ালে থেকেও সেই স্বরে একটু কেঁপে ওঠে সাতনা। কিন্তু কিংকর কাপে না। পাথরটা হঠাৎ খসে আসার ফলে টাল সামলাতে না পেরে সেও পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। কিন্তু খাড়া হওয়ার কোনো চেষ্টা না করে সে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে মিনারের আড়ালে সরে গেল। সর্দার বোকা নয়। দশ দিকে তার চোখ ঘোরে। তবু কিংকর শেষ একটা চেষ্টা করতে চায়। লোভে আর উত্তেজনায় এখন হয়তো সর্দারের মাথার ঠিক নেই।

সর্দার গম্ভীর গলায় বলে, "সাতনা পিস্তল ফেলে দে।"

সাতনা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে, "সর্দার, তোমাকে গুরু বলে মানি। কিন্তু জান নিয়ে টানাটানি হলে আমাকেও অস্ত্র ধরতে হবে।"

সর্দার একটা পেল্লায় মাটি কাঁপানো ধমক দিয়ে বলে, "চোপ শয়তান। সর্দারের পিছন থেকে ছোবল মারতে চেয়েছিলি, তার সাজা কী জানিস?"

"জানি।"

"সেই ছুঁচো কিংকরটা কোথায়?"

"আমার সঙ্গেই আছে।"

"যদি নিজের ভাল চাস তো সরে যা। আগে ওটাকে খুন করব। তোর বিচার তার পরে।"

সাতনা নরম গলায় বলল, "শোনো সর্দার। তোমাকে আমি তোমাকে আমি এমনিতে মারতে পারি না। সেটা অধর্ম হবে। তবে যদি একই জমিতে দাঁড়িয়ে ভগবানের আকাশের

নীচে আমাদের মারার চেষ্টা করো, তাহলে কিন্তু গুলি তোমার দিকেও ছুটবে। রিভলবার আমার হাতেও তৈরি।”

সর্দার একটু চুপ করে থেকে এক পর্দা গলা নামিয়ে বলে, “মেয়ের কথা ভেবে তুই দুর্বল হয়ে পড়েছিলি। তোর মাথা গুলিয়ে গেছে। সেইজন্য তোকে আমি এবারের মতো মাপ করে দিচ্ছি। একটা কথা মনে রাখিস, কাছেপিঠের একশো গাঁয়ে আমার চর আছে। তোর মেয়ে যদি বেঁচে থাকে, তবে তাকে আমি খুঁজে দেব। ভাবিস না।”

হামাগুড়ি দিয়ে মিনারের ও-পিঠে চলে এসেছে কিংকর। সর্দারের পিছন দিকে মাত্র হাত পাঁচেকের মধ্যে এসে থেমেছে সে। অপেক্ষা করছে।

সর্দার সাতনার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। বলল, “সাতনা, এখনো বলছি, ফিরে আয় আমার দিকে। গুপ্তধনের পথ মিলেছে। দুজনে মিলে ভাগ করে নেব। আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে না।”

সাতনা এক-পা পিছু হটে বলে, “দল ভেঙে দেবে?”

“দিতেই হবে। ডাকতরা চিরকাল ডাকাত থাকে না। দুনিয়ার নিয়মে ভোল পালটাতে হয়।”

সাতনা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, “তুমি ভোল পালটাতে পারো সর্দার, কারণ তোমার আসল পরিচয় আজও কেউ জানে না। কিন্তু আমরা দাগি লোক, আমরা ভোল পালটাতে চাইলেও পারব না।”

অসাবধানে সানা ভারী ঢালটা এক হাত থেকে অন্য হাতে নিতে গিয়েছিল। পলকের সেই অসতর্কতাই কাল হল তার। সর্দারের রিভলভার গর্জে উঠল। একটা নয়, দু হাতে দুটো।

“আঃ!” বলে চেঁচিয়ে সাতনা উবু হয়ে বসে পড়ল মাটিতে। ঢালটা ছিটকে গেছে একধারে। আর আড়াল নেই।

সর্দার রিভলভার তুলে ভাল করে নিশানা করছে। আর তখনই তার ঘারে চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল কিংকর।

.

৩৪.

কিংকর ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে কিন্তু সর্দারকে নাগালে পেল না। সর্দার তো সোজা লোক নয়, সাতনার মতো দানবও তাকে খামোখা সমঝে চলে না। পিছন দিকে যেন-বা সত্যিই তার আর দুটো চোখ আছে। কিংকরও কঁপ দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ সর্দারও তড়িৎগতিতে সরে গেছে। কিংকর পড়ল মাটিতে, মুখ থুবড়ে।

সর্দার তার রিভলভার সোজা কিংকরের মাথায় তাক করে সাতনাকে বলল, "তোর অস্ত্র ফেলে দে। নইলে তোর এই প্রাণের ইয়ারকে শেষ করে দেব। "

সাতনা কিংকরের অবস্থাটা দেখল। বোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পস্তাচ্ছে। কিংকর সর্দারের হাত মারা পড়লে সাতনার শোক করার কিছু নেই। কিন্তু ভয় একটাই। কিংকর মরলে জীবনেও আর মেয়েটার খোঁজ পাওয়া যাবে না। সাতনার এখন ধ্যানজ্ঞান তার মেয়ে। একবারে তাকে চোখের দেখা দেখতেই হবে। তারপর মরে গেলেও দুঃখ নেই। কিন্তু এখন যে সংকটে তারা রয়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা দেখছে না সাতনা। সর্দারের হাতে দুজনকেই না মরতে হয়।

সাতনা জানে, সর্দারকে গুলি করার উপায় নেই। এখন আর গুরু বলে সর্দারকে খাতির না করলেও চলে। কারণ সর্দার বিনা কারণে তার দিকে গুলি চালিয়েছে। এখন উলটে গুলি চালালে সাতনার অপরাধ হয় না। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। একটু নড়লেই কিংকরের মাথাটা সর্দারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আর অস্ত্র ৫ ল দিলেও যে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়। সর্দার দুজনকেই মারবে। সুতরাং এই শীতেও সাতনা ঘামতে লাগল।

সর্দার দুম করে একটা গুলি চালিয়ে দিল। কিংকরের মাথার মাটি ছিটকে গেল খানিকটা। একটু হেসে সর্দার বলে, "এখনো ভেবে দেখ সাতনা, খুব। বেশি সময় পাবি না। পরের গুলিটা ওর খুলি ফাটিয়ে দেবে।"

সর্দারের মস্ত টর্চের আলো অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে কিংকরের চারধারে। সেই আলোয় সাতনাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাতনার আর সর্দারের মাঝখানে কেবল একটা বেঁটে কামিনীঝোঁপ। সাতনা ক্ষীণ স্বরে বলল, "দিচ্ছি।"

কিংকরের নড়াচড়ার নাম নেই। এমন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে, যেন বা একটু বাদেই ওর নাকের ডাক শোনা যাবে। অসহায় সাতনা তার আগ্নেয়াস্ত্রটা সর্দারের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বেচারা! প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রিভলভার থেকে আগুন ঝাঁকিয়ে ওঠে। সাতনা তার পাঁজর চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। সর্দারের রিভলভারের নল চকিতে কিংকরের দিকে ফেরে।

চোখে পলক ফেলার মত একটুখানি দেরি হলে হয়তো কিংকর বেঁচে থাকত না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নির্ভুল নিশানায় একটা হট সাঁ করে সর্দারের কপালে লাগে। সর্দার থমকে যায়। বাঁ হাতখানা কপালে চেপে ধরে। কিন্তু পড়েও যায় না, মূর্ছাও হয় না।

ততক্ষণে কিংকর উঠে দাঁড়িয়েছে। খুব-একটা তাড়াহুড়ো করল না সে। শাবলটা কুড়িয়ে নিল শান্তবাবে। তারপর সর্দারের ডান হাতের কব্জিতে আলতোভাবে মারল। রিভলভারটা পড়ে গেল। দু-পা এগিয়ে কিংকর সর্দারের মুখে একখানা ঘুষি চালাল।

সর্দার পড়ল না। এমন কি নড়লও না এতটুকু। হাত বাড়িয়ে সে কিংকরকে প্রায় মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করল দূরে। কিন্তু কিংকর তো ঘাসজলে খায় না। সর্দার যখন তাকে দুহাতে টেনে ওপরে তুলছে তখনই সে তার দুখানা পায়ে ফুটবল-খেলোয়াড়ের মতো দুটে শট কষাল সর্দারের মুখে আর পেটে।

সেই দুটো লাথিতে যে-কোন শক্তসমর্থ লোকেরও জমি নেওয়া উচিত। কিন্তু সর্দারের কাছে তা বোধহয় পিঁপড়ে কামড়ের শামিল। সে শুধু 'উম' করে একটা বিরক্তির শব্দ করল। তারপরই উলটে এক ঘুষি মারল কিংকরকে। ভাগ্যিস ঠিক সময়ে মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল কিংকর।

তারপরই শুরু হল দুজনের ধুন্ধুমার লড়াই।

কে জিতত, কে হারত তা বলা মুশকির। কিন্তু হঠাৎ ঘটনাস্থলে আর একজন লোকের আবির্ভাব হল। মজবুত গড়ন। মাঝারি লম্বা। সে এসেই একটানে কিংকরকে সরিয়ে আনল সর্দারের থাবা থেকে। তারপর নিজে লাফিয়ে পড়ল সর্দারের ওপরে।

এই দু'নম্বর লোকটা লড়তে জানে। মিনিটদুয়েক পরই দেখা গেল, সর্দার হাঁফাচ্ছে। লড়াইয়ের তাল পাচ্ছে না। যতবার ঘুষি লাথি চালায় ততবার তা বাতাস কেটে বেরিয়ে যায়। কুস্তির প্যাঁচে যতবার লোকটাকে কাবু করার চেষ্টা করে ততবার লোকটার পাচে পড়ে যায়।

কিংকরের দম শেষ। সে হাঁফাতে হাঁফাতে কিছুক্ষণ দম নিয়ে টর্চ আর রিভলভার তুলে নেয় মাটি থেকে। দুটোই সর্দারের। রিভলভারটা তুলে ধরে সে আদেশ দেয়, "সর্দার, লড়াই ছাড়ো। ধরা দাও।"

সর্দার একবার তার দিকে তাকায়। তারপর আচমকা প্রতিপক্ষকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিচু হয়ে ভোজবাজির মতো জঙ্গলের আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে যায় চোখের পলকে।

কয়েক মুহূর্ত বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কিংকর সর্দারের অনুসরণ করার জন্য পা বাড়ায়। সেই সময়ে কামিনীঝোঁপের ওপাশ থেকে চলতে চলতে উঠে দাঁড়ায় সাতনা। টর্চের আলোয় দেখা যায়, রক্তে তার বুকের বাঁদিক ভেসে যাচ্ছে। বুকে হাত চেপে ধরে

সাতনা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, "সর্দারের রনপা আছে। পশ্চিমধারে একটা শুড়ি পথ ধরতে হলে সেদিকে যাও, সাবধান।" ....বলে সাতনা আবার ঢলে পড়ে।

কিংকর আর দু'নম্বর লোকটা তৎক্ষণাৎ পশ্চিমদিকে ছুটে যায়।

শুড়ি পথটার ধারেই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দুজন। রামু আর নয়নকাজল। রামুর হাতে কয়েকটা আধলা ইট।

নয়ন বলল, "তোমার ঢিলটা সর্দারের কপালে লেগেছে। নইলে এতক্ষণে কিংকরের হয়ে যেত। কী টিপ তোমার! আর কি সাহস!"

রামু রাগের গলায় বলে, "কিন্তু তুমি অত কাপছ কেন? এত ভয়টা কিসের?"

"ও বাবা! এরা সব সাংঘাতিক লোক। ঢিলটা মেরে তুমি ভাল কাজ করোনি। সর্দার জানতে পারলে তোমাকে আঁস্ত রাখবে না।

"অত সস্তা নয়। তুমি চুপ করে থাকো তো।"

"দেখলে তো নিজের চোখে তিন-তিনটে জোয়ান সর্দারকে কাবু করতে পারল না। তুমি বাচ্চা ছেলে কী করতে পারবে?"

"আর কিছু না করতে পারি ঢিল মারতে পারব। তুমি অত ভয় পেয়ে।"

নয়ন মাথা চুলকে বলে, "বুঝলে দাদাবাবু, আমি খুব-একটা ভিতু ছিলুম। এই ডাকাত হওয়ার পর থেকেই ভয়টা বেড়েছে। ওরে বাপরে! ওটা কি! রাম রাম বলতে বলতে নয়ন মাটিতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকে।

রামু প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, শুড়ি পথটার মুখে ভীষণ ঢ্যাঙা এক মূর্তি হনহন করে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। কম করেও বারো ফুট লম্বা। আবছায়ায় ভাল দেখা যায় না। কিন্তু ভুল নেই।

রামুর রনপায়ে চড়া অভ্যেস আছে। সুতরাং প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সর্দার রনপায়ে চড়ে পালাচ্ছে।

রামু শুড়ি পাথটার মাঝখানে এগিয়ে গিয়ে মূর্তিটার মুখোমুখি দাঁড়াল। তারপর বোঁ-বোঁ করে তার দুটো ঢিল ছুটে গেল নির্ভুল নিশানায়।

রনপায়ে লোকটা একটু থমকে গেল। রামু ভেবেছিল, বুঝি লাগেনি। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মূর্তিটা হঠাৎ টলতে টলতে ধড়াস করে পড়ে গেল।

সেই সঙ্গেই ছুটে এল কিংকর আর সেই লোকটা। কিংকরের হাতে টর্চ। কিংকর চেঁচিয়ে বলল, "শাবাশ রামু!"

একটু বাদে সকলেই ঘিরে দাঁড়াল সংজ্ঞাহীন সর্দারকে। কিংকর শক্ত দড়ি এনে সর্দারের হাত-পা বেঁধে ফেলে। বলে, "বড় সাংঘাতিক লোক, বাঁধা না থাকলে জ্ঞান ফিরে আসার পরই গণ্ডগোল পাকাবে।"

রক্তাম্বর এবং দাড়িগোঁফে সর্দারকে বাঁধা অবস্থাতেও ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

দ্বিতীয় লোকটা আসলে গোবিন্দ। সে এসে রামুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমার এলেম আছে। আমার যা বিদ্যে সব তোমাকে শিখিয়ে দেব।"

রামু মুখ তুলে বলে, তুমি একা কেন গোবিন্দদা? গবাদা আসেনি।"

মৃদু একটু হেসে গোবিন্দ বলে, "গবাদাও এসেছে। একটু তফাতে আছে। পাগল মানুষ তো। এসে পড়বে কিছুক্ষণ বাদে।"

কিংকর সর্দারকে বাঁধার পর মুখের ওপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে আস্তে আস্তে তার নকল দাড়িগোঁফ টেনে খুলছিল। খুলতে খুলতে বলল, "এ লোকটাও চেনা লোক। কিন্তু কিছু করার নেই। ধরিয়ে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এ সর্দার ছিল।"

"নিজেই দ্যাখো।"

রামু টর্চের আলোয় দাড়িগোঁফহীন সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে যায়। এ যে আন্দামান আর নিকোবরের বাবা, দারোগা কুন্দকুসুম।

রামু কঁপতে কাঁপতে বলে, "ইনিই সর্দার?" কিংকর মাথা নাড়ে, "ইনিই।"

.

৩৫.

কুন্দকুসুম যখন চোখ মেলে তাকাল, তখনো সকলের অবাক ভাবটা যায়নি, যাকে বলা যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। হাত-পা-বাঁধা কুন্দকুসুম কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। চারদিকে চেয়ে নিজের অবস্থাটা একটু বুঝে নিল কয়েক সেকেণ্ডে। কিংকরের হাতে একটা মশাল জ্বলছে। তার মস্ত আলোয় সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কুন্দকুসুম রামুর দিকে চেয়ে মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, "তুমি উদ্ধববাবুর ছেলে রামু? আন্দামান আর নিকোবরের বন্ধু?"

রামু এত ঘাবড়ে গেছে যে, গলায় শব্দ এল না। শুধু মাথা নাড়ল।

কুন্দকুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "তোমার টিপ খুব ভাল। আজ তোমার জন্যই সর্দার প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কী! শেষ অবধি অবশ্য পালাতে পেরেছে। কিন্তু বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না।"

এ-কথা শুনে রামুর মাথা একদম গুলিয়ে গেল। বলে কী লোকটা? তাহলে কি কুন্দকুসুম সর্দার নয়?

কুন্দকুসুম চারদিকে আর-একবার চোখ বুলিয়ে রামুকে জিজ্ঞেস করে, "এরা সব কারা বলো তো! আর আমাকে এমনভাবে বেঁধেছেই বা কে? কার এত সাহস?"

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, "সেলাম দারোগাসাহেব। কিছু মনে করবেন না, নিজেদের জান বাঁচাতে আপনাকে একটু বাঁধতে হয়েছে।"

কুন্দকুসুম একটা হুংকার দিয়ে বলে, "খুলে দে। তারপর দেখাই তোর ঘাড়ে কটা মাথা!"

"মাথা একটাই, তবে সেটা এত সস্তা নয়। আপনার তো অনেকগুলো মাথা আর মুখ। কখনো দারোগা, কখনো সর্দার। আপনার একটা মাথা গেলেও আর-একটা থাকবে।"

কুন্দকুসুম একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলে, "দারোগাদের মাঝে মাঝে ছদ্মবেশ ধরতেই হয়, তাতে আশ্চর্যের কী? আমি সর্দার এ কথা তোকে কে বলল রে মার্কেট?

"অত চিল্লাবেন না দারোগাবাবু। এখন আপনি একটু অসুবিধের মধ্যেই আছেন। আমরা ছাপোষা লোক সব, দারোবাবুকেও ভয় খাই, ডাকাতের সর্দারকেও ভয় খাই। কিন্তু আপনার স্যাঙাত সাতনা আপনার গুলি খেয়ে ভারী রেগে গেছে। জানেন তো বাঘ জখম হলে বড় বিপজ্জনক। সে এখন আপনাকে গুরু বলেও মানছে না, দারোগা বলেও মানছে না। আপনার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সে এল বলে।"

কুন্দকুসুমকে একটু অস্বস্তি বোধ করতে দেখা যায়। গলা এক পর্দা নামিয়ে বলে, "তোমরা বিশ্বাস করো, এই ডাকাতের দলটাকে অ্যারেস্ট করার জন্য গত তিনমাস ধরে চেষ্টা করছিলাম। আজই প্রথম এদের ডেরার পাকা সন্ধান পাই। আমার ফোর্স এই জঙ্গলটা ঘিরে আছে এখনও। আমি কাপালিকের ছদ্মবেশে–"

এতক্ষণ কিংকর একটাও কথা বলেনি। এবার সে হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। কুন্দকুসুম কটমট করে তার দিকে চায়।

কিংকর হাসি থামিয়ে বলে, "আমারও সেটা সন্দেহ হয়েছিল দারোগাবাবু, আপনি বোধহয় সর্দার নন। আসল সর্দার বোধ হয় সত্যিই পালিয়েছে। আপনাকে আমরা ছেড়েও দিতে চাই। তবে তার আগে আমাদের কয়েকটা কথা আছে।"

কুন্দকুসুম গম্ভীর হয়ে বলে, "বলে ফেল।"

কিংকর মাথা নেড়ে বলে, "আমার তেমন সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলার অভ্যাস নেই। কথা বলবে গবাদা। আমি তাকে ডেকে আনছি। এই বলে কিংকর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল চকিত পায়ে।

কয়েক মিনিট বাদে একটু দূরে গবার গলা পাওয়া গেল। সে গান গাইছে? "বলো রে মন কালী কালী। আমার বুকটা করে ধুকুর পুকুর, পেটটা লাগে খালি-খালি। অধিক কী আর কবো রে ভাই, মনেতে মোর আনন্দ নাই। কত নাচন-কোঁদন দেখাইলাম রে, তবু দেয় না যে কেউ হাতে লি।"

সামনে এসেই গবা এক হাত জিব কেটে নিজের কান ধরে বলল, "ছিঃ ছিঃ, কী পাষণ্ড রে তোরা! বড়বাবুকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছিস! নরকে যাবি যে রে! খুলে দে! ওরে খুলে দে!"

গবা নিজেই নিচু হয়ে তাড়াতাড়ি কুকুসুমের বাঁধন খুলতে লেগে যায়।

রামু গবাকে দেখেও নড়ে না। তার মনের মধ্যে টিকটিক করে কী যেন একটা হতে থাকে। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শুধু।

গবা কুকুসুমের হাতের বাঁধন খুলে ধরে-ধরে তাকে তুলে বসায়। তারপর সামনে ঢিপ করে মাথা ঠুকে বলে, "বড়বাবু, অপরাধ নেবেন না। ছেলেমানুষ সব, না-বুঝে করে ফেলেছে।"

কুন্দকুসুম গম্ভীর গলায় বলে, "।" গবা নিরীহ গলায় বলে, "মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় আজ্ঞে।" কুন্দকুসুম বলে, "তা বটে..."

গবা হাতজোড় করে বলে, "তা সেই ভুলের কথাই বলছিলুম আর কী। ভুল কি দারোগা-পুলিশেরও হয় না? এই আমাদের গোবিন্দ মাস্টারের কথাই ধরুন না। খুন-টুন করার ছেলেই নয়। তবে ফেঁসে গেছে!"

"তাই নাকি?"

"একেবারে নির্যাস সত্যি কথা।" বলতে বলতে গবা কুকুসুমের পায়ের বাঁধনটা খুলবার চেষ্টা করতে করতে বলে, "এঃ, এই গিটটা বড় এঁটে বসেছে দেখছি। ওদিকে আবার সাতনাকেঁদেখে এলুম একটা খাঁড়ায় ধার দিচ্ছে। নাঃ বড় বিপদ দেখছি। পায়ের বাঁধনটা তাড়াতাড়ি না খুললেই নয়..."।

কুন্দকুসুম একটা ধমক দিয়ে বলে, "ইয়ার্কি রাখো। এটা ইয়ার্কির সময় নয়। কী চাও সেটা স্পষ্ট করে বলো।"

গবা মাথা চুলকে বলে, "আপনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, গরিবের মা-বাপও বটে। আপনার কাছে আব্দার করে চাইব তাতে আর লজ্জা কী! বলছিলাম, গোবিন্দকে খালাসের একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে আপনাকে।"

কুন্দকুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "দেখা যাবে।"

"ভরসা দিচ্ছেন তো?"

কুন্দকুসুম একটু বিষাক্ত হেসে বলে, "হাতি কাদায় পড়েছে বাপু, ভরসা দিয়ে যে আমার উপায় নেই সে তুমি ভালই জানো।"

ভারী লজ্জার ভান করে গবা বলে, "কী যে বলেন বড়বাবু! তা দিলেনই যদি, তবে আরো একটু দিন।"

"আবার কী?"

"আজ্ঞে ওই গুপ্তধনের ব্যাপারটা। ওটা সরকারের হক পাওনা।" কুকুসুমের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে ওঠে।

চাপা গলায় গবা বলে, "প্রাণের দাম যে ওর চেয়ে একটু বেশি বড়বাবু। কিংকর বা সাতনা যেমন লোক, থানা-পুলিশ-কোর্ট-কাছারির তোয়াক্কা করবে না। জানে তো তাতে লাভ নেই। কোন ঝানু উকিল মামলা ঘুরিয়ে আপনাকে খালাস দিয়ে দেবে। তাই ওরা চায় বল্লমে এফেঁড় ওফেঁড় করে চলে যেতে। আমি অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছি।"

কুন্দকুসুম নিভে যায়। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "ঠিক আছে, তাই হবে।"

গবা আবার মাথা চুলকে বলে, "আর একটা কথা।"

"আবার কী?"

"এতই যদি দিলেন তবে আর-একটু বা বাকি থাকে কেন? বলছিলাম, এ-জায়গায় আপনার অনেক দিন চাকুরি হয়ে গেল। আমরা পাঁচজনে দেখছি, এখানকার জল-হাওয়া আপনার তেমন সহ্য হচ্ছে না। শুকিয়ে একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছেন। তাই বলছিলুম আজ্ঞে, একটা বেশ ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গায় বদলি নিয়ে চলে যান না বড়বাবু।"

কুন্দকুসুম থমথমে মুখ করে বলে, "বুঝেছি।"

"আজ্ঞে আপনি বুঝবেন না তো কে বুঝবে! এমন পাকা মাথা দেশে কটা আছে?"

কুন্দকুসুম বিরক্তির গলায় বলে, "এবার পায়ের গিঁটটা খুলতে পারো কি না।"

গবা জিব কেটে বলে, "ঐ দ্যাখো, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছিলাম, ইয়ে বড়বাবু, আর-একটা কথা।"

"আরো কথা?"

"মানে সাতনার কাছে কয়েকটা চিঠি আছে। সর্দারের নিজের হাতের লেখা। কোথায় কোন বাড়িতে ডাকাতি করতে হবে, কাকে খুন করতে হবে, এই সব বৃত্তান্ত, সর্দারের হাতের লেখা সেই সব চিঠি সাতনা আবার পুলিশের কাছে পাঠাতে চায়। আমি বলি, তার কি কোনো দরকার আছে বড়বাবু?"

কুন্দকুসুম বিবর্ণ মুখে বলে, "না। তার দরকার নেই।"

গবা সঙ্গে-সঙ্গে বলে, "হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। দরকার কী? কেঁচো খুঁড়তে আবার সাপ বেরিয়ে পড়বে। তার চেয়ে চিঠি কটা বরং থাক। পরে কাজে লাগবে। "

কুন্দকুসুম ইঙ্গিত বোঝে। একটু চাপা স্বরে বলে, "তোমরা খুব ঘড়েল।"

"ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন! আপনি থাকতে আমরা? হেঃ হেঃ..."

গবা পায়ের বাঁধনটা খুলে দিলে কুন্দকুসুম উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু অত বড় মানুষটা যেন নুয়ে পড়েছে, বয়সটাও যেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেড়ে গেছে।

কুন্দকুসুম ধীরে-ধীরে গিয়ে রণপা দুটো কুড়িয়ে নিল। কারো দিকে একবারও তাকিয়ে রণপায়ে চড়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে জঙ্গলের অন্ধকার আর রহস্যময়তার মিলিয়ে গেল।

.

৩৬.

ঘটনার মাসখানেক পর এক গাঁয়ের রাস্তায় তিনজন হাঁটছিল। গবা পাগলা, সাতনা আর রামু।

একটা পুকুরধার পেরিয়ে কয়েকটা তালগাছের জড়াজড়ি। তারপর একটা বাঁক দেখা যাচ্ছিল। গবা বলল, "ওই বাঁকটা ঘুরলেই যুধিষ্ঠিরের সেই পিসি না মাসির বাড়ি। এসে গেচি হে।"

সাতনার বুকে এখনো ব্যাণ্ডেজ। আঘাত মারাত্মক না হলেও সর্দারের দুটো গুলিই তার পাঁজরে ক্ষত করে দিয়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর মেয়েকে দেখতে পাবে সেই আনন্দে তার হাঁফ ধরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "কথাটা মনে রেখো গবা, মেয়ের কাছে বাপ বলে আমার পরিচয় দিও না।"

"জানি। বলব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।"

সাতনা একটু ভাবল। তারপর বলল, "তারও দরকার নেই। মেয়ে খুব সম্ভব আমাকে চিনতে পারবে। আবছা হলেও আমার কথা তার মনে আছে। এ-চেহারা তো ভোলার নয়। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো। ওই বাঁকের মুখে ঝুপসিআমগাছটার ছায়ায় বসে থাকি। একবার না একবার না একবার সে পুকুরে কিংবা বাগানে বেরোবেই। তখন একটু চোখের দেখা দেখে নেব।"

এ-কথার ওপর গবা কোনো কথা বলতে পারল না। রামুর চোখদুটো ছলছল করতে লাগল। সে ফিরে আসার পর তার বাবা যে আনন্দে কঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে-কথাটা এখন মনে পড়ল তার। বাবাকে আগে তার খুব রাগী আর নির্দয় বলে মনে হত। এখন জানে, বাবা তাকে কত ভালবাসে। সাতনার জন্য তাই তার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

গাছতলায় বসে সাতনা অপলক চোখে কিছুক্ষণ সামনের বাগানঘেরা একতলা পাকা বাড়িটার দিকে চেয়ে রইল। কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। সাতনা গবার দিকে চেয়ে বলল,

"তুমি যে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে না, আমি যে কোনো শাস্তি পেলুম না, এটা কি ঠিক হল?"

গবা মৃদু হেসে বলল, "শাস্তি কাকে বলো তুমি? কত চোর-ছ্যাঁচোড় খুনে জালিয়াতকে তো পুলিশ গারদে ভরে। জেল খেটে কি আর তাদের শুদ্ধি হয়। বাপু হে, আমি বুঝি অনুতাপের আগুন না জ্বললে মানুষের পাপ পোড়ে না। অনুতাপ কাকে বলে জানো? কোনো কাজ করে বিচার দ্বারা তার ভালমন্দ অনুভব করে যে তাপের দরুন মন্দে বিরতি আসে তাই হল অনুতাপ। সেই অনুশোচনায় নিজের মেয়েটার সামনে গিয়ে পর্যন্ত তুমি দাঁড়াতে পারছ না। এর চেয়ে বেশি সাজা তোমাকে আর কে দেবে?"

সাতনা ধুতির খুঁটে চোখের জল মুছল।

ঠিক এ-সময়ে একটা দীঘল চেহারার মেয়ে বেরিয়ে এল। সদ্য স্নান করে এসেছে বুঝি। এক রাশ চুল এলো হয়ে আছে পিঠের দিকে। ভারী সুন্দর মুখোনি। একটা ভেজা কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল বাইরের তারে।

গবা একটু ঠেলা দিয়ে সানাকে বলল, "দ্যাখো হে, দ্যাখো। দানবের মেয়ে কেমন পদ্মফুলটির মতো দেখতে হয়েছে।"

সাতনা জবাব দিল না। সম্মোহিতের মতো চেয়ে রইল মেয়ের দিকে। চোখের পলক পড়ে না, শ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

ধীরে-ধীরে রোদে একটু পায়চারি করল মেয়েটি। তারপর ভিতর থেকে কেউ বুঝি ডাকল। মেয়েটি সাড়া দিল, "যাই।"

তারপর চলে গেল।

গবা উঠে পড়ল। বলল, "মেয়ের সামনে যদি না-ই যেতে পারো তবে আর মায়া বাড়িও না। দশটা গাঁয়ের লোক তোমাকে চেনে। ধরা পড়লে বিপদ আছে। ওঠো, ওঠো।"

সাতনার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল অঝোরে। উঠে আস্তে-আস্তে ফেরার পথ ধরে সে বলল, "যত খারাপ কাজ করেছি তার দশগুণ ভাল কাজ যদি বাকি জীবনটায় করি, তাহলে মেয়ের সামনে একদিন দাঁড়ানোর সাহস হবে না গবা?"

"হবে। খুব হবে। ইচ্ছেটাই আসল, অনুতাপটাই আসল।"

সাতনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলে, "তাহলে এখান থেকেই আমায় বিদায় দাও ভাই। পৃথিবী জায়গাটা বিশাল, কাজেরও অন্ত নেই। দেরি করে কী হবে। এক্ষুনি শুরু করে দিই গিয়ে।"

গবা মাথা নাড়ল, "এসো তবে।"

সাতনা একটু ভেবে বলল, "আর একটা কথা। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ওর বিয়ে হোক। তুমি ব্যবস্থা করবে?"

গবা একটু হেসে বলল, "করব। ভেবো না।"

"তাহলে যাই।"

চোখের পলকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সাতনা বাঁ পাশের মাঠটা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামু গবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এল ভারী মনে।

পুলিশ নতুন করে রিপোর্ট দেওয়ায় গোবিন্দ মাস্টারের মামলা আবার আদালতে উঠেছে। গোবিন্দর পক্ষে সওয়ালে নেমেছেন মস্ত মস্ত ডাকসাইটে সব উকিল। সামন্তমশাই তাদের মোটা টাকা দিচ্ছেন। গোবিন্দ নিজে গিয়ে শহরে ধরা দেওয়ার পর ফের জামিনে খালাস পেয়ে সারকাসে তার খেলা দেখাচ্ছে। মামলার যা গতিক তাতে সে খালাস পাবেই।

কুন্দকুসুম বদলি হয়নি। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে সপরিবারে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। সেখানে নাকি চাষবাস নিয়ে থাকবে। নতুন যে দারোগা এসেছে, তার নাম চন্দ্রাতপ খাঁড়া।

ভারী ভাল লোক। প্রায়ই উদ্ধববাবুর বাড়িতে এসে রামুকে আদর করেন আর কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়ান।

উদ্ধববাবুর হঠাৎ জ্ঞানচক্ষু খুলেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, রাঘব ঘোষ তার চেয়ে ভাল গাইয়ে। তাই আজকাল সন্ধের পর রাঘবের বৈঠকখানায়। গিয়ে বসেন প্রায়ই। চোখ বুজে গান শোনেন আর রিফ করেন, "ওয়াঃ, ওয়াঃ, কেয়াবাত।"

রাঘব ব্যথিত স্বরে বলে, "কেয়াবাতটাও ঠিক জায়গামতো বলতে পারছেন উদ্ধববাবু! বেজায়গায় তারিফ করলে সুর কেটে যায়।"

উদ্ধববাবু ভারী লজ্জা পান।

নয়নকাজলের সঙ্গে এখন আর কাকাতুয়ার আড়াআড়ি নেই। সরকারি লোকেরা গুপ্তধনের প্রায় দু-কলসি মোহর উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। কাকাতুয়াকে তাই এখন হরিনাম শেখানো হচ্ছে। তবে পাখিটার স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল। ভোর হতে না-হতেই সে ডাকতে থাকে, "রামু ওঠো। রামু ওঠো। মুখ ধোও। পড়তে বসো।"

রামুর মনে বহুদিন ধরেই একটা খটকা লেগে আছে। সে একদিন গবাকে ধরে পড়ল, সেই কিংকর লোকটা সেই রাত্রে যে হাওয়া হয়ে গেল তারপর আর তার দেখা পেলাম না কেন বলো তো! কোথায় গেল সে?"

গবা এক গাল হেসে বলে, "সেই কথাটা কিন্তু খুব গুহ্য কথা। কেউ জানতে পারে!"

"কেউ জানবে না। "

"তবে বলি। সেই যে তোমাকে আলফা সেনটরের কথা বলেছিলুম, মনে আছে?"

"আছে। আলফা সেনটর হল সৌরলোকের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। পৃথিবী। থেকে চার আলোকবর্ষ দূরে।"

"বাঃ, ঠিক বলেছ। সেখান থেকে একদল লোক আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে যায়, জানো তো!"

"জানি। কিন্তু সে তো গুল।"

"তাহলে বলব না।"

"আচ্ছা, গুল নয়। বলো।"

"আলফা সেনটরের একটা গ্রহের নাম হচ্ছে নয়নতারা। কিংকর হল আসলে সেই গ্রহের লোক। ডাকাতদের সঙ্গে যখন আমরা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলুম না, তখন আমি টেলিপ্যাথিতে নয়নতারায় খবর পাঠাই। খবর পেয়ে কিংকর একদিন একটা মহাকাশযানে চেপে চলে এল। তারপর সব ঠিকঠাক করে দিয়ে সামলে-সুমলে দিয়ে ঘটনার সেই রাত্রে আবার নয়নতারায় ফিরে গেছে।"

"আর তুমি কে গবাদা?"

"আমি? ও বাবা, ও আবার কেমনধারা কথা! আমি হচ্ছি আমি, গবগবাগব পাগলা খুড়ো, উলিঝুলি ফোকলাটেকো নাংলাবুড়ো। ঝুলদাড়ি আর ঝোলা গোঁফে গুমসো ছিরি, নালে-ঝোলে চোখের জলে জড়াজড়ি!"

"তুমি কিন্তু মোটেই বুড়ো নও। বুড়োদের চামড়া এত টান থাকে না।"

"থাকে থাকে। এ কি তোমাদের এই নোংরা জায়গার আধমরা বুড়ো নাকি! এসব মেড ইন অ্যানাদার ওয়ার্ড।"

"তার মানে?"

"কথাটা কিন্তু খুব গুহ্য। গোপন রেখো।"

“রাখব। কিন্তু ফের গুল দিলে!”

“আহা, আগে শোনোই না। কাউকে বেলো না। আমিও আসলে ওই নয়নতারার লোক। সেখানে জল-হাওয়ার এমন গুণ যে, দেড়শো দুশো বছর বয়সে মানুষের যৌবন আসে।”

“ফের গুল?”

“গুল নয় গো। শুনলে প্রত্যয় যাবে না, সেখানে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের লোকেরা হামা দেয়। ত্রিশ-চল্লিশে গিয়ে হাঁটতে শেখে। আধো-আধো বোল ফোটে তখন। সত্তর বছর বয়সে আমাদের হাতেখড়ি। পঁচাত্তর বছর বয়সে ইসকুলের পাঠ শুরু। সেখানে গেলে দেখবে আশি নব্বই বছরের লোকরা ঢিল মেরে আম পাড়ছে, ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, ক্রিকেট খেলছে।”

“সেখানে কি কিংকরদার গাঁয়েই তোমার বাড়ি?”

“হ্যাঁ, তা বলতে পারো একরকম। পাশাপাশি গাঁ। ওর গাঁয়ের নাম বাঘমারি, আমার গাঁ হল কুমিরগড়। দু গাঁয়ের মধ্যে দুরত্ব মাত্র শ-পাঁচেক মাইল, একই থানা আমাদের।”

“বলো কী! পাঁচশো মাইল দূরের গাঁ কি পাশের গাঁ হল নাকি?”

গবা খুব হাসে। বলে, “তোমাদের এখানকার মতো তো নয়। আমাদের গ্রহটাও যে বিশাল। আমাদের একটা জেলা তোমাদের গোটা ভারতবর্ষের সমান। চলো একবার তোমাদের নিয়ে যাব। জামবাটি ভর্তি সরদুধ আর সবরিকলা আর নতুন গুড় দিয়ে মেখে চিড়ের এমন ফলার খাওয়াব না! আর সেই জামবাটির সাইজ কী! ঠিক তোমার ওই পড়ার ঘরখানার মতো.... . ”

“গুল! গুল!”

“আহা, শোনোই না.... ”

পরদিনই গবা আবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নয়নতারাতেই ফিরে গেল কি না কে জানে!